গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৭ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ৩ - ৯ এপ্রিল, ২০১৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

পুলিশের লাঠির মুখে এস ইউ সি আই (সি) নেতা-কর্মীরা

আলু চাষিদের থেকে সরকারকে আলু কিনতে হবে, এই দাবিতে ২৫ মার্চ পশ্চিম মেদিনীপুরে জেলাশাসক দপ্তরে জেলা সম্পাদক কমরেড অমল মাইতির নেতৃত্বে বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিচার্জ

সংবাদ চারের পাতায়

মৌলবাদীরা প্রমাণ করেছে তারা মানবতার শত্রু

আইএসআইএস জঙ্গিরা বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতা এবং শিল্প নিদর্শনগুলিকে ধ্বংস করছে, এই ছবি দেখে অনেকেই শিউরে উঠেছেন, কষ্ট পেয়েছেন। ইরাক, সিরিয়া সহ মধ্য প্রাচ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আইএসআইএস বা ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া নামে সংগঠনের জঙ্গিরা গত বছরের জুন জুলাই মাস থেকে শুরু করে এই বছর মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মেসোপটেমিয়া, সুমের ব্যাবলনীয় সভ্যতার অসংখ্য নিদর্শনকে হাতুড়ির ঘায়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছে। তার মধ্যে আছে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের ইরাকের হাতরা নগরীর ধ্বংসাবশেষ, কমপক্ষে তিন হাজার বছরের পুরনো আসিরিয় সভ্যতার সবচেয়ে বড় নগরী নিনেভ-এর স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের নিদর্শন, টাইগ্রিস নদীর তীরে সুমেরিয় সভ্যতার নিদর্শনে সমৃদ্ধ নগর মসুলের মিউজিয়াম। মসুলের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে রক্ষিত আরবের প্রচীন বৈজ্ঞানিকদের গণিত সংক্রান্ত আবিষ্কারের বহু পুঁথিও ধ্বংস হয়েছে। সাড়ে তিন হাজার বছরের প্রাচীন নিমরুদ, খোরসাবাদও রেহাই পায়নি। ইসলাম ধর্মের অন্যতম মহাপুরুষ ইউনুস, যিনি খ্রিস্টান এবং ইহুদিদের কাছে জোনা নামে সম্মানিত, মসুলে তাঁর মসজিদ হাতুড়ির ঘায়ে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিরিয়াতেও পাঁচ হাজার বছর আগেকার প্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ অব্দের ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতার নিদর্শন এ ভাবেই শেষ হয়ে গেছে। এই নিদর্শনগুলি ছিল মানবসভ্যতার অগ্রগতির পদচিহ্ন, সভ্যতার দ্যোতক। আইএস জঙ্গিরা গত ২৫ ফেব্রুয়ারি একটি ভিডিও প্রকাশ করে বলেছে, ইসলামের বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খায় না এমন যে কোনও কিছুকে ধ্বংস করার জন্য পয়গম্বর আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও বিশ্বজুড়ে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের সাথে ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসীরাও এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।

আফগানিস্থানের তালিবানরা ১৭০০ বছরের প্রাচীন আফগানিস্থানের হিন্দুকুশ পর্বতের বামিয়ান উপত্যকার বুদ্ধ মূর্তিগুলিকে ২০০১ সালের মার্চ মাসে ট্যাঙ্ক এবং কামানের গোলায় ধ্বংস করেছিল। তাদের প্রতিনিধি মোল্লা উকিল এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'এই মূর্তিগুলি এবং কাবুল মিউজিয়ামের যে সব সামগ্রী আমরা ধ্বংস করেছি সেগুলি যে আফগানিস্তানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অঙ্গ তা আমরা জানি। কিন্তু এগুলি আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের বিরোধী, তাই এগুলি থাকুক আমরা চাই না'।

ভারতে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিল বিজেপি, আরএসএস, বজরঙ দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাহিনী। বিজেপি নেতারা যুক্তি দিয়েছিলেন তাঁদের বিশ্বাস ঐ বাবরি মসজিদের স্থানেই রামের জন্মভূমি ছিল, এর জন্য অন্য কোনও প্রমাণের দরকার নেই, বিশ্বাসই যথেষ্ট। তাঁরা মানতে চাননি যে, ৫০০ বছরের পুরনো কোনও সৌধ নিজেই ইতিহাস, অতীতে যদি কোনও অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেও থাকে, তাহলে সেটিও ইতিহাসের অঙ্গ, গায়ের জোরে সে ইতিহাসকে পরিবর্তন করা যায় না। তাঁরা মানতে চাননি রামায়ণ, মহাভারতের মতো মহাকাব্যে ইতিহাসের উপাদান কিছু মিলতে পারে, কিন্তু এগুলিকেই ইতিহাস বলে ধরে নেওয়াটা ইতিহাস সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা। এই বিজেপি-সঙ্ঘ পরিবারের

দুয়ের পাতায় দেখুন

'দেশসেবার' টিকিট পেতে বিজেপিতে লাঠালাঠি

পুরভোটে প্রার্থী বাছাইকে কেন্দ্র করে রাজ্য বিজেপিতে পক্ষকাল জুড়ে চলেছে ধুন্ধুমার কাণ্ড। রাজ্য নেতৃত্ব যে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছেন তার বিরুদ্ধে দলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর দফায় দফায় বিক্ষোভ, পার্টি অফিসে ভাঙচুর, দলীয় পতাকা জ্বালিয়ে দেওয়া, রাজ্য নেতাদের নামে মুর্দাবাদ স্লোগান ইত্যাদি নানা ঘটনা ঘটেছে। কোথাও কোথাও রাজ্য সভাপতির কুশপুতুলও পোড়ানো হয়েছে। এই বিক্ষোভ সামাল দিতে ব্যর্থ হয়ে রাজ্য নেতৃত্ব শেষপর্যন্ত দলীয় অফিসে পাল্টা লেঠেল বাহিনী মজুত করেছেন এবং তাদের দিয়ে কর্মীদের পিটিয়েছেন। যার ফলে কিছু কর্মীর মাথা ফেটেছে, কারও হাত-পা ভেঙেছে। এক জনের আঘাত এমন গুরুতর যে, তার সিটি স্ক্যান করাতে হয়েছে। শুধু কলকাতাতেই নয়, বিক্ষোভ হয়েছে সমস্ত জেলাতেই। মারমুখী কর্মীদের বিক্ষোভে কোনও কোনও নেতা ঘরবন্দি থেকেছেন, কেউ গা-ঢাকা দিয়েছেন অন্যত্র। এই চূড়ান্ত নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে রাজ্যের সংবাদপত্রগুলির কেউ প্রথম পাতায় হেডিং করেছে 'বিজেপিতে যেন আগুন লেগেছে', কেউ লিখেছে, 'বিজেপি অফিস রণক্ষেত্র'। আবার কেউ লিখেছে, 'পুরভোটেই যদি এই হাল হয় বড় ভোটে কী হবে?'

বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা বলেছেন, এই বিক্ষোভ দল বড় হওয়ার লক্ষণ। রাহুলবাবু মুখে যা-ই বলুন, নেতাদের উদ্দেশে কর্মীদের কুৎসিত গালাগালি আর মারামারি যে শক্তিবৃদ্ধির লক্ষণ নয়, তা তিনিও বোঝেন? মিসড কল দিলেই বিজেপির সদস্য! কে চোর-ডাকাত-গুণ্ডা-বদমাস দেখার দরকার নেই, বিজেপির সদস্য হওয়ার দরজা হাট করে খোলা। ফলে বেনোজলে বিজেপির সাগর টইটম্বুর। এ রাজ্যে গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ১৭ শতাংশ ভোট পেয়েছে। এতেই যদি পার্টি অফিসে মারপিট হয় তা হলে আরও বেশি ভোট পেলে রাহুলবাবুর তত্ত্ব অনুসারে কি খুনোখুনি হবে?

রাহুলবাবু সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, 'কোনও ওয়ার্ডে ২০ জন প্রার্থী হওয়ার জন্য আবেদন করে থাকলেও টিকিট পাবেন একজনই।

পাঁচের পাতায় দেখুন

সিপিআই পার্টি কংগ্রেসে কমরেড প্রভাস ঘোষ

২৫ মার্চ পণ্ডিচেরিতে অনুষ্ঠিত সিপিআই দলের ২২তম কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ নিম্নের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

শ্রদ্ধেয় কমরেড এ বি বর্ধন, প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ, অন্যান্য বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ ও কমরেড প্রতিনিধিবৃন্দ,

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সিপিআই আমাদের দশে সবচেয়ে পুরনো বামপন্থী দল এবং সংগ্রামের ঐতিহ্য এ দলের আছে। আদর্শগত পার্থক্য সত্ত্বেও, আমরা অন্যান্যদের কাছ থেকে যেমন, তেমনই সিপিআই-এর ওইসব সংগ্রামগুলি থেকেও শিক্ষা নিয়েছি।

আপনাদের সাধারণ সম্পাদকের পেশ করা প্রতিবেদনের সাথে আমি একমত যে, বিশ্ব পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ এখন গভীর সংকটে নিমজ্জিত। মহান লেনিন বহুকাল আগেই দেখান যে, পুঁজিবাদ তার বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর একচেটিয়া পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদে পৌঁছেছে এবং এটা তার মরণাপন্ন স্তর, যেখানে সে গভীরতম সংকট নিয়ে চলছে। বর্তমানে সেই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। বলা যায়, ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভেন্টিলেশনে রয়েছে। এমন কোনও চিকিৎসক নেই এই মৃতপ্রায় পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে বাঁচাতে পারে ।

সাতের পাতায় দেখুন

পণ্ডিচেরিতে বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

মৌলবাদীরা মানবতার শত্রু

একের পাতার পর

হাতেই ঘটেছে গুজরাট দাঙ্গা, উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরের দাঙ্গা, গ্রাহাম স্টেন হত্যা সহ আরও বেশকিছু সংখ্যালঘু নিধন যজ্ঞ। এরাই এখন গুজরাটে বিজ্ঞানের নামে অতিপ্রাকৃত কল্পকাহিনীকে সিলেবাসে ঢুকিয়েছে। বিজ্ঞান কংগ্রেসে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের জিগির তোলার জন্য অবাস্তব গল্পকে সত্য বলে চালাতে চেয়েছে।

এই হল মৌলবাদের চরিত্র। যে কোনও ধর্মেরই মৌলবাদীদের মধ্যে এই একই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। মানব সভ্যতার উন্মেষ থেকে বর্তমান আধুনিক সভ্যতা পর্যন্ত মানুষের অগ্রগতির সুনির্দিষ্ট গতিধারাকে আবিষ্কার করেছে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস। ইতিহাস দেখিয়েছে প্রকৃতিকে জয় করবার লড়াইয়ের প্রয়োজনে মানব সমাজ প্রকৃতির নিয়মকে জানবার চেষ্টা করতে গিয়ে একদিন ঈশ্বর চিন্তার জন্ম দিয়েছিল। সেই পথ বেয়ে দাস সমাজের অন্যায় অত্যাচারের সামনে সাধারণ মানুষের চোখের জলের মূল্য দিয়ে এসেছিল ধর্ম। দাস সমাজ ভেঙেছে, এসেছে সামন্ততন্ত্র। ইতিহাসই দেখিয়েছে সভ্যতার অগ্রগতির পথে মানুষ যখন প্রকৃতির নিয়মকে আরও জেনে নতুন সমাজিক নিয়মের ভিত্তিতে সামন্ততন্ত্রকে ভেঙে উন্নত সমাজব্যবস্থার জন্ম দিতে চেয়েছে তখন পুরাতন সমাজপতিরা তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। ধর্ম তখন রাজার হাতে হাতিয়ার হয়ে শোষিত মানুষকে বিনা বাক্যব্যয়ে রাজার শাসনকে মেনে নিতে শেখাতে চেয়েছে। সেই সময় ধর্মের নিয়মকে শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় বলে দেখানোর চেষ্টা করার মধ্যে জড়িয়ে ছিল শাসকের স্বার্থ। তারাই একে মদত দিয়েছে। ধর্মের নামে কূপমণ্ডুকতা, ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়গত বিভেদ, অবাস্তব তন্ত্র-মন্ত্র-অলৌকিক ক্রিয়া কলাপের দ্বারা মানুষকে ভয় দেখাতে চেয়েছে তারা। এর মধ্য দিয়ে চেয়েছে যুক্তি বুদ্ধি তর্ক করার শক্তিকে মারতে। ধর্মের মানব কল্যাণের দিকটি ঢাকা পড়ে গিয়ে ধর্ম হয়ে উঠেছিল এক অচলায়তন। বুর্জোয়ারা একদিন এর বিরুদ্ধে লড়েছিল। কিন্তু তারাই পরবর্তীকালে বুর্জোয়া সমাজের সংকটের দিনে তাদের শোষণ টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এ যুগে গড়ে ওঠা ধর্মীয় মৌলবাদকে মদত দিয়েছে এবং আজও দিয়ে চলেছে। মৌলবাদ ও টিকে থাকা সামন্ততান্ত্রিক কূপমণ্ডুক চিন্তার সঙ্গে আপস করে চলে আজকের বুর্জোয়া শাসকরা। ইরাকের আইএস, আফগানিস্তানের তালিবান যেমন সাহায্য পায় আমেরিকা ব্রিটেনের। ভারতের সংঘ পরিবার ও তাদের সহযোগীরা সাহায্য পায় একচেটিয়া কর্পোরেট মালিকদের। এদের মধ্যেকার অদ্ভুত মিল এই কথাকেই আবার প্রমাণ করে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসের ধারা মানুষকে শেখায় কোনও মতবাদ, কোনও সমাজ ব্যবস্থা চিরস্থায়ী নয়। সভ্যতা এগিয়ে চলে নতুন দিনের নতুন সত্যের ভিত্তিতে। দুনিয়ার কোনও শক্তি নেই এই অগ্রগতির ধারাকে রুখে দেয়। কিন্তু পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা এই ইতিহাসকে চাপা দিতে চায়, চায় মানুষের ঐক্য ভাঙতে। মৌলবাদ তাদের হাতে আজ বড় শক্তি। কয়েক হাজার বছর ধরে চলা ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিকৃত করে এই শক্তি রসদ সংগ্রহ করে। তাই মানব সভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস এদের কাছে ভয়ের। সে জন্যই ইতিহাস ধ্বংস করে এরা। মৌলবাদ ধর্মের মধ্যেকার উদার দিকটিকে সম্পূর্ণ ঢেকে দেয়। সমস্ত যুক্তি, বুদ্ধিকে গলা টিপে হত্যা করে, ধর্মের নামে বিদ্বেষ, বৈরিতার আবহাওয়া তৈরি করে। মৌলবাদ ধর্মীয় মহাপুরুষদের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে তাঁদের পথ অনুসরণ করার জিগির তোলে, কিন্তু সেই মহাপুরুষের শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য আজকের দিনে কী, তা চর্চার বদলে গ্রহণ করে অন্ধ অনুকরণের পথ। এমনকী ধর্মের মধ্যেও যে বিভিন্ন মতামত আছে তাকে তারা স্বীকার করে না। যার জন্য একই ধর্মের নানা গোষ্ঠীর মধ্যে ঘটে চলে সংঘর্ষ। আইএস যেমন ইসলামের কথা বললেও সুন্নি আবেগ থেকে শিয়া বা সুফি মতাদর্শের ধর্মস্থানকে ধ্বংস করছে। এই চিন্তার ধাঁচা মানুষকে মনুষ্যত্ব বর্জিত ধর্মোন্মাদ করে তোলে। মৌলবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, তারা নিজের ধর্মকে সবার উপরে দেখানোর উগ্র বাসনায় দেখাতে চায় সেই ধর্ম থেকেই পৃথিবীর ইতিহাস শুরু তার আগে কিছুই ছিল না। এই বিশ্বাসের সঙ্গে মেলে না এমন সমস্ত ঐতিহাসিক নিদর্শন তারা ধ্বংস করতে চায়। সমস্ত ধর্মের বড়মানুষরা যে পরমত সহিষ্ণুতার কথা বলেছেন মৌলবাদীরা তা মানে না। তাই সৌদি আরবের যে শাসকরা নিজেদের ইসলামের রক্ষাকর্তা বলে গর্ব করে তারা সম্প্রতি মক্কা ও মদিনায় প্রাক ইসলামিক কিছু ঐতিহাসিক সৌধ শপিং মল বা আবাসনের জন্য ভেঙে দিয়েছে। অথচ ইতিহাস হচ্ছে, মক্কা এবং মদিনায় প্রবেশ করার সময় হজরত মহম্মদ নিজ মুখে তাঁর অনুগামীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন এই প্রাচীন ধর্মস্থানগুলিকে যেন মর্যাদা সহকারে রক্ষা করা হয়।

পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল, ইতিহাসের বিচারে যাকে মানব সভ্যতার আঁতুড়ঘর বলা যায়। সেই মধ্যপ্রাচ্য এভাবে সন্ত্রাসবাদ এবং মৌলবাদের আঁতুড়ঘর হয়ে গেল কীভাবে? কারা এই মৌলবাদী শক্তিগুলির অর্থ এবং অস্ত্রের জোগানদাতা? আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-এর প্রাক্তন অফিসার গ্রাহাম ফুলারের মতে, 'আমেরিকার ভূমিকার জন্যই আইএস জঙ্গিদের মতো মৌলবাদীদের উত্থানের জমি তৈরি হয়েছে'। তালিবানদের সৃষ্টি করেছিল আমেরিকা, আফগানিস্তান সহ এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের আদর্শগত এবং রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব করার জন্য। বুর্জোয়া সমাজকে ভেঙে রাশিয়াতে যে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এসেছিল সেই সমাজ নতুন যুগের মূল্যবোধ, নীতি নৈতিকতার ভিত্তিতে মানুষের মনকে তৈরি করবার জন্য লড়াই করছিল। তার প্রভাব পড়েছিল সারা দুনিয়াতে। মৌলবাদের মোকাবিলায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ এর থেকে শক্তি অর্জন করছিলেন। কিন্তু সাময়িকভাবে হলেও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজ অনুপস্থিত। এই পরিস্থিতিতে সমাম্রাজ্যবাদী শক্তি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সারা দুনিয়ায়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকা-ব্রিটেন পেট্রোলিয়াম সমৃদ্ধ পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকায় নিজেদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় রাখতে দীর্ঘদিন ধরেই এই সমস্ত এলাকায় জাতিগত দাঙ্গা এবং ধর্মীয় মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। যতদিন বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির ছিল তার প্রভাবে এই সমস্ত এলাকায় মৌলবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক চেতনার শক্তি বেশ কিছুটা সক্রিয় ছিল। তাই মৌলবাদীরা ইচ্ছা করলেই সকলকে এমনকী ধর্ম বিশ্বাসী সাধারণ মানুষকেও মৌলবাদের সমর্থক করে তুলতে পারেনি। মধ্য প্রাচ্যেও ইরাক সহ কিছু দেশে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু আজ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতি, গণতান্ত্রিক চেতনার উপর আঘাত হেনেছে। যার ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সহজেই যেমন যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে পারছে পাশাপাশি মানুষের মানবিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক চেতনাকে অবলুপ্ত করার জন্য মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। আমেরিকার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমস্কি সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ২০০৩ সালে আমেরিকান আক্রমণের আগে বাগদাদে সিয়া-সুন্নিদের কোনও পৃথক মহল্লা ছিল না। কে কোন সম্প্রদায়ের এ নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামাত না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। অথচ ইরাক আক্রমণের তিন-চার বছর পরেই দেখা গেল মার্কিন সরকার এবং সৌদি আরব ও কাতারের ধনকুবেরদের দ্বারা আর্থিক, নৈতিক এবং অন্যভাবে পুষ্ট চরম মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি ইরাক জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সিয়া, সুন্নি, কুর্দ এবং অন্যান্য সম্প্রদায় ও জাতিসত্তাগুলির মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। ইরাকি সমাজের ধর্মনিরপেক্ষ আবহাওয়া সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। যারা কিছুদিন আগেই মিলেমিশে ছিল সেই সব মানুষই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গত বিভেদে একে অপরের গলায় ছুরি ধরেছে এই সাম্রাজ্যবাদীদের গড়ে দেওয়া পরিবেশের জন্যই।

২০০৩-এর আগে ইরাকের মহিলারা সরকারি চাকরির ৫০ শতাংশ অধিকার করেছিলেন। দেশের অর্ধেক ডাক্তার ছিলেন মহিলা। সরকারি ব্যবস্থাপনায় শিশু কল্যাণ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু থাকায় ইরাকের মহিলারা আশেপাশের দেশগুলির মধ্যে ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগণ্য। আমেরিকার আগ্রাসনের ১২ বছর পর আজ তাঁরা সবচেয়ে পিছিয়ে। ১২ বছরের বেশি বয়সের মেয়েদের ২৫ শতাংশ নিরক্ষর। বাল্য বিবাহ বেড়ে গেছে সাংঘাতিকভাবে। ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতির চাপ পড়েছে মহিলাদের উপর সবচেয়ে বেশি। শুধুমাত্র মহিলা বলে অনেকের কাজ চলে গেছে। এঁদের অনেকেই যুদ্ধে পরিজনদের হারিয়েছেন। সন্তানকে বাঁচানোর জন্য পিএইচডি ডিগ্রিধারী মহিলাকে দেহ বিক্রি করতে রাস্তায় নামতে হয়েছে। তাতে মৌলবাদীদের কিছু এসে যায়নি, কিন্তু মেয়েরা স্কুলে গেলে তাদের উপর মৌলবাদীদের আক্রমণ বাড়ছে। স্কুল ছাত্রীদের ধর্ষণ এবং অপহরণের ঘটনা এত বেড়েছে যে বহু পরিবার মেয়েদের বাঁচাতে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। (আল জাজিরা, ৮ মার্চ)

আইএস জঙ্গিদের অস্ত্র জোগাচ্ছে কে? একটি টেলিভিশন চ্যানেল গত ৮ মার্চ দেখায় আইএস-এর জন্য অস্ত্রবাহী ব্রিটিশ এবং মার্কিন বিমানকে গুলি করে নামিয়েছে ইরাকের সেনাবাহিনী। যে আইএসের বিরুদ্ধে বিমানহানা চালাচ্ছে আমেরিকা-ব্রিটেন, আবার সেই বাহিনীকেই অস্ত্র জোগাচ্ছে তারাই। আমেরিকার আসল ভূমিকা বোঝা যায় যখন, আইএস-এর নেতা তথা ইসলামিক স্টেটের ঘোষিত খলিফা আল বাগদাদিকে কারাগার থেকে ছেড়ে দেয় তারা। বাগদাদি যে সিআইএ দ্বারা ট্রেনিং প্রাপ্ত তা আমেরিকার বহু সেনানায়ক স্বীকারও করেছেন। মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি জো বিডেন তো মেনেই নিয়েছেন সিরিয়ার আসাদ সরকারকে উচ্ছেদ করতে তুরস্ক, কাতার, সৌদি আরবের ধনকুবেররা যে কোনও অর্থ খরচ করতে প্রস্তুত। তারাই আইএস, আল কায়দা, জাভাত আল-নুসরা এবং অন্যান্য সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক। আমেরিকার পরম মিত্র সৌদি আরব তার বড়দাদাদের সবুজ সিগন্যাল না পেয়েই এই কাজ করছে, তা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বেকুবেও বিশ্বাস করবে না। সিরিয়ায় আসাদ সরকারকে উচ্ছেদ করতে আমেরিকা র‍্যাডিকাল

ছয়ের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

পূর্ব মেদিনীপুরের নোনাকুড়ি এলাকায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রবীণ কমরেড বাসুদেব ধাড়া (৮০) ৫ মার্চ আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ১৯৭৮ সাল থেকে পরপর চারবার দলের প্রার্থী হয়ে শহিদ মাতঙ্গিনী পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর থেকে বয়সে ছোটদের নেতৃত্ব হাসিমুখে মেনে নিয়েই তিনি আমৃত্যু দলের কাজকর্ম সাধ্য মতো করে গেছেন।

২২ মার্চ বল্লুক নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমরেড বাসুদেব ধাড়ার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভায় তাঁর সংগ্রামী জীবনের স্মৃতিচারণা করেন কমরেড আশুতোষ সামন্ত, দলের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তপন ভৌমিক এবং স্মরণসভার সভাপতি দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড হীরেন্দ্রনাথ জানা।

কমরেড বাসুদেব ধাড়া লাল সেলাম

জীবনাবসান

কোচবিহার জেলার এস ইউ সি আই (সি)-র দেওয়ানগঞ্জ লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড ফলিন্দ্র বর্মন ১৬ মার্চ গভীর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ছিলেন একজন দরিদ্র ভাগচাষি। এলাকার বেনাম ও খাস জমি উদ্ধারের দুর্বার আন্দোলনে তিনি গরিব ভাগচাষিদের নিয়ে সামিল হয়েছিলেন। এজন্য তৎকালীন জোতদার, জে এল আর ও এবং পুলিশের মিলিত চক্র তাঁকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেয়। মিথ্যা সাক্ষ্য-প্রমাণাদি খাড়া করে তাঁকে জেলে পুরে দেওয়া হয়। তিনি ছয় মাস কারদণ্ড ভোগ করেন। দেওয়ানগঞ্জ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় আধিয়ার এবং খেতমজুরের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে এবং তাঁদের দাবি পূরণে প্রয়াত কমরেড নিজের সমস্ত ব্যক্তিগত সমস্যাকে দূরে ঠেলে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পঞ্চায়েতের নানা লোভ-লালসা, চাওয়া-পাওয়াকে উপেক্ষা করে কমরেড ফলিন্দ্র বর্মন দলের সব ধরনের আঞ্চলিক আন্দোলনে শুধু নিজেকে নয়, গোটা পরিবারকে যুক্ত করেছেন। কোনও বাধাই তাঁকে হার মানাতে পারেনি। ১৭ মার্চ তাঁর মৃত্যুসংবাদ দলীয় দপ্তরে পৌঁছলে এলাকার সমস্ত দলীয় কর্মী তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হয়ে তাঁর মরদেহে পুষ্পস্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন কোচবিহার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রুহল আমিন।

কমরেড ফলিন্দ্র বর্মন লাল সেলাম

বিপ্লবী দল বিচারের সঠিক পদ্ধতি কী হবে

শিবদাস ঘোষ

(বর্তমানে ভারতের পুঁজিবাদী আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার চরম সংকট থেকে দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-নৈতিক জীবনে যে ঘোর অনিশ্চয়তা ও সংকট দেখা দিয়েছে, তা থেকে উত্তরণের পথ দেখাতে পারে একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। কিন্তু মার্কসবাদের উপলব্ধি ও প্রয়োগ সঠিকভাবে করার জন্য চাই সর্বহারা শ্রেণির যথার্থ বিপ্লবী বা সাম্যবাদী দল। সেই দল বিচার করে চিনে নেওয়ার জন্যই আমরা এ বার এস ইউ সি আই (সি) দলের প্রতিষ্ঠা দিবস ২৪ এপ্রিলকে সামনে রেখে বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি অমূল্য আলোচনার অংশবিশেষ প্রকাশ করছি।)

ভারতবর্ষের শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য, যে শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাটি আমাদের বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আমাদের বিকাশের পথটিকে, সমাজের অপ্রতিহত অগ্রগতির পথটিকেই রুদ্ধ করে বসে আছে তাকে ভেঙে ফেলে সমাজের অবাধ বিকাশের পথটিকে খুলে দেবার জন্য বিপ্লব আমাদের চাই এবং এই বিপ্লবের জন্য বিপ্লবী দলও আমাদের চাই। আর, হাজারো রকমের বিপ্লবী(!) তত্ত্ব এবং প্রচারের ডামাডোলের ভিতর থেকেই, কাজটি যত কঠিন হোক না কেন, সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি কোনটি, সেটি আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে।

এখন, একটি দল শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দল কি দল নয় — এই জটিল বিচারটি করব আমরা কিসের সাহায্যে? সে কি দলের নেতাদের গরম গরম বিপ্লবী বুলি দিয়ে? তাহলে তো সত্যিকারের শ্রমিক শ্রেণির দল বিচারের কোনও উপায়ই থাকবে না। কারণ, বিপ্লবী বুলি আওড়াতে তো কেউই আমরা পিছিয়ে নেই। লেনিন আমাদের শিখিয়েছেন, একটি বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লব হতে পারে না এবং এই জন্যই একটি বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া একটি সত্যিকারের বিপ্লবী দল গড়ে উঠতে পারে না। লেনিন যখন বলেছেন বিপ্লবী তত্ত্ব, তখন তিনি একটি দলের শুধু রাজনৈতিক প্রোগ্রাম এবং পলিসি বোঝাতে চাননি, তিনি বিপ্লবী তত্ত্ব বলতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কর্তৃক জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারণাগুলিকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে কো-অর্ডিনেট (সংযোজিত) করে একটি পুরো জ্ঞানের পরিমণ্ডলকেই (epistemological category) বুঝিয়েছেন।

তাহলে, কোনও দল বিচারের ক্ষেত্রে প্রথমত, দলটির বিপ্লবী রাজনৈতিক তত্ত্বটিকে বিচার করে দেখতে হবে। দেখতে হবে, যে রাজনৈতিক তত্ত্বটিকে তারা বিপ্লবী বলে প্রচার করছে তা আসলে বিপ্লবী কি না। অর্থাৎ তাদের বিপ্লবী তত্ত্বটি আমাদের সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরে বিপ্লবের যে জটিল প্রক্রিয়াটি চালু রয়েছে তার যথার্থ ও বাস্তব প্রতিফলন কি না। দ্বিতীয়ত, দেখতে হবে, দলটির আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজস্ব কোন বিশ্লেষণ আছে কি নেই এবং যদি থাকে তাহলে সেটি যথার্থ মার্কসবাদসম্মত বিশ্লেষণ কি না। তৃতীয়ত, এগুলো দেখার সাথে সাথে দল বিচারের ক্ষেত্রে আরও দেখতে হবে, প্রতিটি ঘটনা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সেই দলের বিচারধারা (methodological approach) কী এবং দলের মূল রণনীতি, প্ল্যান, প্রোগ্রাম এবং সংগ্রাম পরিচালনার কৌশল কোন শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে এবং চতুর্থত দেখতে হবে, সেই দলের নেতা ও কর্মীদের জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে আচরণ এবং চলবার রীতিনীতি কোন শ্রেণির সংস্কৃতিগত মান প্রতিফলিত করছে। এখানে মনে রাখতে হবে, নেতা ও কর্মীদের পরস্পরের মধ্যে ও জনতার সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে গোঁড়ামি ও যুক্তিহীন আচরণে প্রশ্রয়দান, নানা বুর্জোয়া কুসংস্কারের প্রভাব, অন্ধতা, একগুঁয়েমি, উচ্ছৃঙ্খলতা, হামবড়া ভাব, মিথ্যা বলার অভ্যাস — এগুলো থাকলে বুঝতে হবে, বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রভাব দলের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে পুরোমাত্রায় বর্তমান।

তাহলে দেখা গেল, দল বিচারের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যেমন পার্টির বিপ্লবী তত্ত্বকে প্রথমে বিচার করতে হবে, তেমনি সাথে সাথে সেই দলের চিন্তা ও বিচার পদ্ধতি এবং দলের নেতা ও কর্মীদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের মধ্যে সংস্কৃতিগত মান যা তাঁরা প্রতিফলিত করছেন, তাকেও বিচার করে দল সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। কারণ, মনে রাখতে হবে, বুর্জোয়া মানবতাবাদ থেকে উন্নততর সাংস্কৃতিক মান, অর্থাৎ সর্বহারা সংস্কৃতিগত মান অর্জন করা ব্যতিরেকে এই তত্ত্ব সম্পর্কে বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার প্রয়োগও সঠিক হতে পারে না। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন এবং মাও-এর মূল বিচারধারা সম্পর্কে যাঁরা জানেন, তাঁরাই আমাদের এ কথা বুঝতে সক্ষম হবেন। এখানে আর একটি কথাও মনে রাখতে হবে। প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োগ ছাড়া মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে শুধুমাত্র বই পড়া জ্ঞান, অথবা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সংযোজন ছাড়া শুধুমাত্র শোষিত মানুষের আন্দোলনগুলি পরিচালনার

মধ্য দিয়ে অর্জিত যে জ্ঞান — এই দুটোই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে আংশিক জ্ঞান মাত্র। সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরাই জানেন, এই দুটোকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সংযোজিত করতে পারলেই কেবলমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক তত্ত্বের ধারণা অর্জন করা সম্ভব। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উন্নততর সাংস্কৃতিক মান অর্জন করতে না পারলে এ দুটো আংশিক জ্ঞানকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সঠিকভাবে সংযোজন করে চৌকস জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, অর্থাৎ তত্ত্ব বিচারের ক্ষমতা অর্জন করা কখনই সম্ভব হতে পারে না। এই দিকগুলি সম্পর্কে খেয়াল রেখেই দল বিচারের দুরূহ কাজটি আমাদের সম্পন্ন করতে হবে।

এছাড়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও দল বিচারের সময় খেয়াল রাখতে হবে। দেখতে হবে, পার্টিটি কী পদ্ধতিতে, কোন ধরনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এবং তার নেতৃত্ব সম্বন্ধে ধারণাটি কী? সেটি কি পেটিবুর্জোয়া পার্টিগুলির মতোই আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক (formal democratic) নেতৃত্বের ধারণা, নাকি গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ, অর্থাৎ প্রোলেটারিয়ান গণতন্ত্র ও একেন্দ্রীকরণের নীতির সংমিশ্রণের মারফত গড়ে ওঠা সেটি একটি যৌথ নেতৃত্বের ধারণা। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, বুর্জোয়া বিপ্লব যেহেতু উৎপাদনের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে উৎপাদিকা শক্তি, উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদনের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এবং এক অর্থে ব্যক্তির বিকাশ ও ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার বিপ্লব, সেইহেতু বুর্জোয়া গণতন্ত্র, তা যত আদর্শস্থানীয় (model) গণতান্ত্রিক ফর্মেরই হোক না কেন, সেখানে গণতান্ত্রিক ফর্ম-এর মধ্য দিয়ে আসলে ব্যক্তিনেতৃত্বই কাজ করে থাকে। এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তিই হল কেন্দ্রবিন্দু এবং এ সম্বন্ধে সচেতন উপলব্ধি না থাকলেও বাস্তবে এক ব্যক্তি বা বিভিন্ন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই এই গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রক্রিয়াটি গড়ে ওঠে। ফলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রে আসলে গণতন্ত্রের নামে ব্যক্তিনেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে এই গণতন্ত্রের চরিত্র হয়ে পড়ে 'ফর্মাল'। অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যেহেতু ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা এবং শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে উৎপাদনের ওপর যৌথ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিপ্লব, সেইহেতু শ্রমিক শ্রেণির গণতন্ত্রে নেতৃত্বের ধারণা হচ্ছে যৌথ নেতৃত্বের ধারণা।

এই যৌথ নেতৃত্বের ধারণা বলতে কী বোঝায়? লেনিন বলেছেন, দলের সকল সদস্যের যৌথ জ্ঞানই হচ্ছে যৌথ নেতৃত্ব। অর্থাৎ শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়েই নয়, জীবনের প্রতিটি সমস্যা সম্পর্কে পার্টির সমস্ত সভ্যের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে যৌথজ্ঞান গড়ে ওঠে সেই যৌথজ্ঞানের বিশেষীকৃত রূপে (concrete form) প্রকাশ হচ্ছে যৌথ নেতৃত্ব। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ওপর আলোচনায় আমি এটাকে আরও একটু ব্যাখ্যা করে বলেছি, এ যুগে কোনও একটি দল অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তিনেতৃত্ব ও ব্যক্তিবাদের অবসান ঘটিয়ে একমাত্র তখনই এই যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম, যখন পার্টির সমস্ত নেতা ও কর্মীর চিন্তাভাবনার দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে যৌথজ্ঞান গড়ে ওঠে সেটার ব্যক্তিকরণ ও বিশেষীকৃত প্রকাশ ঘটেছে, অর্থাৎ একজন নেতার মধ্য দিয়ে এই যৌথ নেতৃত্বের সর্বোত্তম রূপে ব্যক্তিকরণ ঘটেছে। কারণ, দলের নেতা ও কর্মীদের চিন্তাভাবনা ও অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে যৌথজ্ঞান দলের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠে সেই নেতৃত্ব, অর্থাৎ 'অথরিটি'র ধারণা, কোনওমতেই বিমূর্ত (abstract) হতে পারে না। আর, এইজন্যই যৌথ নেতৃত্বের অভ্যুত্থান ঘটেছে এ কথার বাস্তব প্রমাণ হল যে, সেক্ষেত্রে কোনও না কোনও একজন নেতার মধ্য দিয়ে এই যৌথজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে ব্যক্তিকরণ (personification) ঘটেছে।

বিষয়টিকে একটু ব্যাখ্যা করে বললে আপনাদের পক্ষে বোঝা সুবিধা হবে। ধরুন, আপনি-আমি যে চিন্তা করি, যাকে আমরা ব্যক্তিচিন্তা বলি, সেটা কী? একজন ব্যক্তির মধ্য দিয়ে সামাজিক চিন্তার যেভাবে ব্যক্তিকরণ ঘটে, তাকেই আমরা ব্যক্তিচিন্তা বলি। ঠিক তেমনিই পার্টির নেতা, কর্মী, সাধারণ সভ্য ও সমর্থকদের ও শ্রমিক শ্রেণি এবং জনসাধারণের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে সম্মিলিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জন্ম নিচ্ছে, সংগ্রামের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত প্রত্যেকের মধ্যেই সেই চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ব্যক্তিকরণ ঘটছে। কিন্তু, যেহেতু আমরা জানি, এই বস্তুজগতে কোনও দুটো বিষয় (phenomenon) একেবারে হুবহু এক হতে পারে না, সেই একই কারণে পার্টির সমস্ত সভ্য ও নেতাদের সম্মিলিত সংগ্রামের দ্বারা অর্জিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের উপলব্ধি সকলের মধ্যে এক হতে পারে না। যার মধ্য দিয়ে এই যৌথ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে ব্যক্তিকরণ ঘটে, তিনিই যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত রূপ হিসাবে দেখা দেন। রাশিয়ান বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে লেনিন এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মাও সে-তুঙ-এর অভ্যুত্থান সেই সমস্ত পার্টিগুলিতে যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যৌথ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছে মানে হচ্ছে, দলের সমস্ত নেতা ও কর্মী, র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল, শ্রমিক শ্রেণি ও জনসাধারণের সম্মিলিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে যৌথ জ্ঞান গড়ে ওঠে, দলের সর্বোচ্চ কমিটির কোনও একজন নেতার মধ্য দিয়ে তার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে ব্যক্তিকরণ ঘটেছে। দলের সম্মিলিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কোন একজন নেতার মধ্য দিয়ে যখন এইভাবে সর্বোত্তমরূপে ব্যক্তিকরণ হয়, নেতৃত্বের বিকাশের একমাত্র সেই স্তরেই দলের অভ্যন্তরে 'গ্রুপইজম' এবং নেতৃত্বের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ব্যক্তিনেতৃত্ব ও বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের প্রভাবকে সম্পূর্ণ রূপে খতম করা সম্ভব এবং দলের অভ্যন্তরে এই অবস্থার উদ্ভব হলেই একমাত্র বলা চলে যে, দলটি প্রোলেটারিয়ান গণতন্ত্রের নীতিকে চালু করতে এবং যৌথ নেতৃত্বের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে। দলীয় নেতৃত্বের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত মনে রাখতে হবে, দলটির অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের নীতির দোহাই পেড়ে ও যৌথ নেতৃত্বের নামে আসলে আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক নেতৃত্বই কাজ করে চলেছে।

এই যৌথ জ্ঞান বলতে শুধুমাত্র অর্থনীতিগত বা রাজনীতিগত ধ্যানধারণাগুলিকেই বোঝায় না, জীবনের সর্বস্তরে অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্য থেকে শুরু করে সামাজিক, পারিবারিক সম্পর্ক পর্যন্ত ব্যক্তিগত ধারণা ও আচরণের সমস্ত স্তরে — একটি সংযোজিত এবং সামগ্রিক (co-ordinated and comprehensive) ধারণাকে বুঝিয়ে থাকে। পার্টি কর্মী ও নেতাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে

সাতের পাতায় দেখুন

আলু সহ ফসলের ন্যায্য দাম ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ, অবরোধ

চাষিদের মৃত্যু-মিছিল চলছেই। সরকার ব্যস্ত ধামাচাপা দিতে। এই অবস্থায় একদিকে এস ইউ সি আই (সি), অপরদিকে কৃষক সংগঠন এ আই কে কে এম এস নেমেছে আন্দোলনে। আলুর কুইন্টাল পিছু এক হাজার টাকা দাম সহ ধান-পাটের ন্যায্য দাম, ফাটকাবাজদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা, লাভজনক দামে সরকার কর্তৃক সরাসরি চাষির কাছ থেকে ফসল কেনা, ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ মকুব, আত্মঘাতী কৃষকদের পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া, স্বল্প দামে সার বীজ বিদ্যুৎ ডিজেল কৃষিসরঞ্জাম সরবরাহ সহ নানা দাবিতে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ, ডেপুটেশন, পথঅবরোধ চলছে।

২৩ মার্চ আলিপুরদুয়ারে আলুচাষি সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে গণঅনশনে সামিল বিক্ষোভকারীরা

২৮ মার্চ জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে কৃষক বিক্ষোভ

নদিয়া ঃ উপরোক্ত দাবি সহ পলাশিতে তিন বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ২৩ মার্চ এ আই কে কে এম এস-এর ডাকে এলাকার কৃষকরা পলাশি বাসস্ট্যান্ডের কাছে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। বহু সাধারণ মানুষ এই অবরোধে সামিল হন। রাস্তার উপর আলু পুড়িয়ে চাষিরা বিক্ষোভ দেখান। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জাকিমউদ্দিন, জেলা সম্পাদক কমরেড মহিউদ্দিন মণ্ডল এবং এস ইউ সি আই (সি)-র জেলা কমিটির সদস্য কমরেড হররোজ আলি।

জলপাইগুড়ি ঃ ধূপগুড়ি ব্লকের বানারহাট থানার ফটকটারি গ্রামের আলুচাষি নিত্যগোপাল বর্মন ২৪ মার্চ আত্মহত্যা করেন। এই সংবাদ পেয়ে এ আই কে কে এম এস জেলা সম্পাদক কমরেড হরিভক্ত সর্দারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ওই দিনই তাঁর বাড়িতে গিয়ে পরিবারকে সমবেদনা জানান। কমরেড সরদার উপস্থিত গ্রামবাসীদের বলেন, সরকারের মদতে ফড়ে এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে সর্বস্বান্ত চাষিরা আত্মহত্যা করলে সমস্যার কোনও সমাধান হবে না। তিনি কিছু আন্দোলনের প্রস্তাব দিলে সকলে উৎসাহের সাথে তা গ্রহণ করেন। ২৮ মার্চ ধূপগুড়ি লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে চৌপথিতে নিত্যগোপাল বর্মন সহ সারা রাজ্যের আত্মঘাতী চাষিদের স্মরণে শোকবেদিতে শ্রদ্ধা জানানো হয়। কমিটির ইনচার্জ কমরেড নিরঞ্জন রায় উপস্থিত মানুষের সামনে তাঁর বক্তব্যে মৃত চাষিদের ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং সমস্ত কৃষিঋণ মকুবের দাবি জানান। ২৮ মার্চ জেলার ময়নাগুড়ি রোডে জাতীয় সড়ক এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে অবরোধ করা হয়। বহু আলুচাষি ও সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অবরোধে সামিল হন এবং সরাকরি উদাসীনতার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। নেতৃত্ব দেন দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস অমল রায়, সুজিত ঘোষ এবং এ আই কে কে এম এস জেলা সম্পাদক কমরেড হরিভক্ত সর্দার ও সভাপতি কমরেড সুরেশ রায়।

উত্তর ২৪ পরগণা ঃ এ আই কে কে এম এস-এর উদ্যোগে ২৫ মার্চ হাবড়ায় ৩৫নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে চাষিরা এবং আলু পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখায়।

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ "আলু কেনার দাবিতে এসইউসি-র বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে বুধবার মেদিনীপুরে জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মিছিল করে জেলাশাসকের অফিসে যাওয়ার কথা ছিল এসইউসি-র। কিন্তু গেটে মোতায়েন পুলিশ কর্মীরা কার্যালয়ের গেট বন্ধ করে দেন। বিক্ষোভকারীরা জোর করে ভিতরে ঢুকতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। ঘটনায় বেশ কয়েকজন এসইউসি কর্মী আহত হন। ঘটনার প্রতিবাদে প্রায় এক ঘণ্টা পথ অবরোধ করেন এসইউসি কর্মী-সমর্থকরা।

এসইউসি-র জেলা সম্পাদক অমল মাইতি, জেলার অন্যতম নেতা তুষার জানা প্রমুখ এদিনের আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন।" বর্তমান ঃ ২৬ মার্চ

জেলায় জেলায় শ্রমিক-কর্মচারী সম্মেলন

বীরভূম ঃ ২০ মার্চ মুরারই-এ এ আই ইউ টি ইউ সি-র সপ্তম বীরভূম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাজগাঁও স্টোন কোম্পানি লেবার ইউনিয়ন, বীরভূম পাথর শ্রমিক ইউনিয়ন, বীরভূম রিক্সা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, বীরভূম বিড়ি মজদুর ইউনিয়ন, মুরারই থানার মোরাম খাদান শ্রমিক ইউনিয়ন, পাকুর কোয়ারিজ মজদুর ইউনিয়ন, আই ডি বি আই ব্যাঙ্ক কন্ট্রাক্টরস শ্রমিক, আশা কর্মী, মোটরভ্যান চালক ইউনিয়ন, পুরকর্মী ইউনিয়ন থেকে ২১০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। জেলা সভাপতি কমরেড মহম্মদ কুদ্দুস আলি সম্মেলন পরিচালনা করেন। জেলা সম্পাদক কমরেড রফিকুল হাসান সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা, রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড দীপক দেব, এস ইউ সি আই (সি)-র বীরভূম জেলা সম্পাদক কমরেড মদন ঘটক প্রমুখ। সম্মেলন থেকে কমরেড মদন ঘটককে সভাপতি এবং কমরেড রফিকুল হাসানকে সম্পাদক করে এক শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়।

হাওড়া ঃ বন্ধ কারখানা খোলা, ন্যূনতম মজুরি চালু এবং শ্রমিক শ্রেণির অর্জিত অধিকার রক্ষার দাবিতে ১৭ মার্চ এ আই ইউ টি ইউ সি-র হাওড়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড অলোক ঘোষ। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, শিপ বিল্ডার্স, কাঁচ শিল্প, কাগজ শিল্প, ছাতা কারখানা, রঙ শিল্প, রেল, ব্যাঙ্ক, বিমা, নির্মাণ কর্মী, পরিচারিকা, মোটরভ্যান চালক, গ্রামীণ মজদুর, অস্থায়ী কর্মচারী ও সরকারি কর্মচারী সহ দেড় শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন পরিচালনা করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি কমরেড দেবাশিস রায়, সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও সাংগঠনিক প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আগত প্রতিনিধিরা। সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি কমরেডস দীপক দেব ও সমর সিনহা বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে কমরেড অলোক ঘোষকে সম্পাদক, কমরেড তাপস দাসকে সভাপতি এবং কমরেড তাপস বেরাকে কোষাধ্যক্ষ করে ২১ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

মুর্শিদাবাদ ঃ ২২ মার্চ বহরমপুর গ্রান্ট হলে এ আই ইউ টি ইউ সি-র ৫ম মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হয়। আশা, আই সি ডি এস, সরকারি কর্মচারী, বিড়ি শ্রমিক, মোটর পরিবহণ কর্মী, মোটরভ্যান চালক, বিদ্যুৎকর্মী ও নির্মাণ কর্মী সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিক প্রতিনিধিরা সম্পাদকীয় রিপোর্টের উপর আলোচনা করেন। সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কমরেড দীপক দেব ও কমরেড অমল সেন প্রতিনিধিদের উদ্দেশে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। কমরেড আব্দুস সঈদকে সভাপতি, কমরেড আনিসুল আম্বিয়াকে সম্পাদক করে ২৮ জনের জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়।

বহরমপুরে শ্রমিক প্রতিনিধিদের একাংশ

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ মোটরভ্যান চালকদের লাইসেন্স প্রদান, বিড়ি ও নির্মাণ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, সামাজিক সুরক্ষা, আশা, আই সি ডি এস, ওয়াটার ক্যারিয়ার, সুইপার কর্মচারীদের সরকারি কর্মীর মর্যাদা প্রদানের দাবিতে ও সরকারি সংস্থায় বেসরকারিকরণ, কর্মী ও কর্ম সংকোচনের প্রতিবাদে ১৩ মার্চ মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর হলে অনুষ্ঠিত হয় এ আই ইউ টি ইউ সি-র পঞ্চম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন। মেদিনীপুর রেল স্টেশন থেকে শ্রমিক কর্মচারীদের এক সুসজ্জিত মিছিল সম্মেলনস্থলে উপস্থিত হয়। ২১৭ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। জেলা সম্পাদক কমরেড নারায়ণ অধিকারী সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রস্তাব পাঠ করেন সহ সভাপতি কমরেড গৌরীশঙ্কর দাস। বিশেষ অতিথি ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) জেলা সম্পাদক কমরেড অমল মাইতি। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অশোক দাস। কমরেড সিদ্ধার্থ মহাপাত্রকে সভাপতি এবং কমরেড নারায়ণ অধিকারীকে সম্পাদক করে ২৭ সদস্যের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

মালদায় শ্রমিক প্রতিনিধিদের একাংশ

মালদা ঃ মোটরভ্যান চালকদের লাইসেন্স, বিড়ি শ্রমিকদের সরকার নির্ধারিত মজুরি, অসংগঠিত নানা ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সরকারি প্রকল্পের সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার দাবি নিয়ে ২৩ মার্চ মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে শ্রমিক সম্মেলন হয়। সম্মেলনে মোটরভ্যান চালক, বিড়ি শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, রিক্সা চালক, হকার সহ নানা অংশের শ্রমিকরা ছিলেন। সম্মেলনে অংশুধর মণ্ডলকে সম্পাদক এবং অশ্বিনী কুমার মণ্ডলকে সভাপতি করে কমিটি গঠিত হয়।

কর্মসংস্থানের দাবিতে
জঙ্গলমহলে যুব সম্মেলন

সরকারি উদ্যোগে শালপাতা, কেন্দুপাতা ন্যায্য মূল্যে গরিব মানুষের কাছ থেকে কিনে বনাঞ্চলভিত্তিক কারখানা গড়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, ব্লক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার নিয়োগ ও পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবনদায়ী ওষুধ সরবরাহ করা, ব্লকের সমস্ত খেলার মাঠকে সংস্কার করা ও গোপীবল্লভপুরে ক্রীড়া স্টেডিয়াম নির্মাণ করা, ঝাড়গ্রাম থেকে বারিপদা ভায়া গোপীবল্লভপুর রেল লাইন স্থাপন, সুবর্ণরেখা নদীর উপর ব্যারেজ নির্মাণ করে জলসেচের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি দাবিতে এ আই ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে পশ্চিম মেদিনীপুরের কমলাশোল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫ মার্চ গোপীবল্লভপুর ব্লক যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড তমাল সামন্ত, রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর, রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড চিত্ত পড়্যা, কমরেড রাজকুমার মাহাত, কমরেড বিশ্বরূপ মাহাত। প্রধান বক্তা কমরেড নিরঞ্জন নস্কর বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবীদের জীবন সংগ্রামকে পাথেয় করে এবং বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় ডি ওয়াই ও-র নেতৃত্বে যুব আন্দোলন গড়ে উঠছে। সকলকে সেই আন্দোলনে সামিল হতে হবে।

সাম্প্রতিক রানাঘাট কাণ্ড নিয়ে একটি নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সম্মেলন থেকে কমরেড বিশ্বরূপ মাহাতকে সভাপতি এবং কমরেড রাজকুমার মাহাতকে সম্পাদক করে ১৪ জনের কমিটি গঠিত হয়।

চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান

প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে ২২ মার্চ বৃত্তি প্রাপকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ১৯৯২ সাল থেকে প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ আয়োজিত এ জাতীয় বৃত্তি, শংসাপত্র ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন পর্ষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। এ দিনের অনুষ্ঠানে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার ডঃ পবিত্র গুপ্ত পর্ষদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। পর্ষদের সহ সভাপতি, প্রাক্তন অধ্যক্ষ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, কোনও সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়নি। পূর্বতন ও বর্তমান রাজ্য সরকার শিক্ষাকে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিতে সচেষ্ট। বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতির সমালোচনা করেন। অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল একটি সুদৃশ্য স্মরণিকা প্রকাশ করেন। অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার এই কর্মকাণ্ডের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে অসুস্থতার কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পারায় সভাপতিত্ব করেন পর্ষদের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে লিখিত বার্তা পাঠান। এ ছাড়াও বহু বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন।

পর্ষদ সম্পাদক রতন লস্কর বলেন, আজ এখানে ৬৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে এবং ৩ এপ্রিল শিলিগুড়ির 'মিত্র সম্মিলনী' হলে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির ১৫০ জনকে বৃত্তি প্রদান করা হবে। রাজ্যভিত্তিক বৃত্তি এককালীন ১২০০ টাকা এবং জেলাভিত্তিক বৃত্তি এককালীন ৬০০ টাকা। এবারে যুগ্মভাবে প্রথম স্থানাধিকারী কিংশুক বর্মন ও শুভস্মিতা সাহাকে স্বর্ণপদক ও সুশীল কুমার মুখার্জী স্মৃতিপদক দেওয়া হয়েছে, দ্বিতীয় স্থানাধিকারী সায়ন মাইতিকে রৌপ্যপদক এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী কোয়েল দাসকে ব্রোঞ্জ পদক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়।

সভায় উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা

বিজেপি দপ্তরে লাঠালাঠি

একের পাতার পর

বাকিদের মধ্যে ক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক'। যারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন সেই নেতা-কর্মীরাও বলছেন, অন্য দল থেকে এসে যে কেউ বিজেপির প্রার্থী হয়ে যাচ্ছে। নিচুতলার কর্মীদের অভিযোগ, বহু জায়গায় প্রার্থী করা হচ্ছে কোটি কোটি টাকার মালিকদের, এমনকী দাগি ক্রিমিনালদেরও। ফলে যারা দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি করছেন তারা উপেক্ষিত। নিচু তলার নেতা-কর্মীরা এও বলছেন নেতাদের কেউ কেউ লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে টিকিট বিলি করেছেন। এই অভিযোগ তুলে রাগে ক্ষোভে কোনও কোনও জেলা সভাপতি পদত্যাগ পর্যন্ত করেছেন। এই অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ থেকে দেখা যাচ্ছে এই বিক্ষোভের মূলে রয়েছে ভোটের টিকিট নিয়ে কাড়াকাড়ি।

কেন টিকিট পাওয়া নিয়ে এত কাড়াকাড়ি? যারা টিকিট পেয়েছেন বা যারা টিকিট পেতে চান প্রত্যেকেই বলছেন, তারা দেশের সেবা করার জন্য ভোটে দাঁড়াতে চান। তারা মানুষের সেবার জন্য নাকি এমন উদগ্রীব যে দল তাকে টিকিট না দিলে দেশসেবার জন্য অন্য দলে ভিড়ে যাচ্ছেন। কেউ বলছেন মানুষের সেবার জন্য তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে আসা, আবার কেউ কেউ বলছেন এই একই কারণে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যাওয়া। এই ভাবেই আয়ারাম-গয়ারামরা দল বদল করছে। দলবদলের যে বাহানাই তাঁরা দিন না কেন, বুঝতে অসুবিধা হয় না এর মধ্যে কোথাও জনসেবা বা সমাজসেবার চিহ্নমাত্র নেই। থাকলে এই সব স্বঘোষিত 'দেশসেবক'রা প্রথমেই জনগণের সামনে স্পষ্ট করে বলতেন কেন আগের দলে থেকে জনগণের স্বার্থে কাজ করা যায় নি।

কোনও একটা দলের রাজনৈতিক তত্ত্ব ও কর্মসূচি যদি জনস্বার্থের পরিপন্থী হয় তা হলে সেই দল ত্যাগ করার অধিকার অবশ্যই সংশ্লিষ্ট দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের আছে। কিন্তু যাঁরা এ দল ও দল করছেন, তাদের দল বদল কি এই কারণেই? এ বিষয়ে তারা স্পষ্ট করে কি কিছু জনগণকে বলেছেন? বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, যে এলাকায় যে দলে ভিড়লে নির্বাচনে জেতা সহজ হবে, তাঁরা সেই দলে যাচ্ছেন। এর মধ্যে রয়েছে ভোটে জেতার হিসেবি স্বার্থবুদ্ধি। এর মধ্যে কোথায় জনস্বার্থ, কোথায় বা দেশসেবা? ভোটে জিতে ক্ষমতার মধুভাণ্ড ভোগ করাই এর এক এবং অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য। এ তো নিকৃষ্ট ব্যক্তিস্বার্থপরতা। নিজের স্বার্থ ষোলকলা পূরণের এই মতলবই তো রাজনীতিকে দেশ সেবার মাধ্যম থেকে আখের গোছানোতে টেনে নামিয়েছে। আখের গোছানোর জন্যই গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব, যা দেশ জুড়ে বিজেপিতে চলছে।

তা হলে কোথায় বিজেপির ভিন্নতা? বিজেপি নাকি একটা ভিন্ন ধরনের নীতি ভিত্তিক, সুশৃঙ্খল, সুসংগঠিত দল বলেযে প্রচার সংবাদমাধ্যমে পরিকল্পনা মাফিক একসময় তোলা হয়েছিল, তা কত মিথ্যা এবং অতিরঞ্জিত, টিকিট নিয়ে মারপিট সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। এই বিজেপিই নাকি তৃণমূল এবং কংগ্রেসের বিকল্প! এ কথা কি এখনও বিশ্বাস করতে হবে?

রাজ্যে রাজ্যে শহিদ ভগৎ সিং দিবস পালিত

ত্রিপুরা ঃ ২৩ মার্চ শহিদ ভগৎ সিং-এর আত্মবলিদান দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করে ছাত্র সংগঠন ডি এস ও, যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও এবং মহিলা সংগঠন এম এস এস। তিন সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে ত্রিপুরার আগরতলা পোস্ট অফিস চৌমুহনী, উদয়পুরের থানা চৌমুহনী এবং ধর্মনগরের মোটর বাসস্ট্যান্ডে ছবিতে মাল্যদান, স্মারকব্যাজ পরিধান এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়। রামঠাকুর কলেজ গেটে ভগৎ সিং-এর উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন করে ডি এস ও।

আগরতলা

ঝাড়খণ্ড ঃ ঘাটশিলা কলেজে ডি এস ও-র উদ্যোগে আলোচনা সভায় ভগৎ সিং-এর বিপ্লবী কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক নরেশ, অধ্যাপক মিত্রেশ্বর এবং ডঃ কবিতা। সভা শেষে মশাল মিছিল হয়। চারশো ছাত্র-ছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করেন। পরে ভগৎ সিং-এর জীবন সংগ্রামের উপর রচিত সিনেমা দেখানো হয়।

জামশেদপুর

উত্তরপ্রদেশ ঃ কানপুরে জনপ্রতিরোধ আন্দোলন সমিতি এবং ডি এস ও যৌথভাবে স্মরণ অনুষ্ঠান করে। ভগৎ সিং-এর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা, ধর্মমুক্ত মানবতাবাদী চেতনা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে এই প্রয়াস বহু চিন্তাশীল মানুষকে আকৃষ্ট করে।

অন্ধ্রপ্রদেশ ঃ শহিদ ভগৎ সিং দিবস উপলক্ষে ২৩ থেকে ৩০ মার্চ সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে এ আই ডি এস ও এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র হায়দরাবাদ জেলা কমিটি। বিভিন্ন স্কুল-কলেজে শহিদ বেদিতে মাল্যদান, ব্যাজ পরিধান, আলোচনাসভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। খৈরাতাবাদে মোমবাতি মিছিল হয়।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ রাজ্যের অসংখ্য স্থানের সাথে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের ঘড়ি মোড়, কাশীবাটি, মহারাজা ও খলসিতে ডি এস ও-র উদ্যোগে ভগৎ সিং দিবস পালিত হয়। নদীয়ার কৃষ্ণনগরে এই বিপ্লবীকে স্মরণে করে নানা কর্মসূচি পালিত হয়। কলকাতার তারাতলায় ডি এস ও-ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে ভগৎ সিং-এর ছবি সংবলিত সাইকেল মিছিল হয়। ভবানীপুরে ওয়াকার্স অ্যান্ড টকার্স ক্লাবের উদ্যোগে এবং ভাটিয়াবাড়ি আবাসনের কিশোর-কিশোরীরা ভগৎ সিং আত্মোৎসর্গ দিবস পালন করে। এছাড়া অন্যান্য রাজ্যেও দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়।

কলকাতার তারাতলায় সাইকেল মিছিল

ক্যানিং-এ চিকিৎসা শিবির

ক্যানিং-এর তালদিতে 'আমরা কজন' ক্লাব এবং 'মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার'-এর যৌথ উদ্যোগে ২২ মার্চ একটি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। অস্থি রোগ, শিশু রোগ, স্ত্রী রোগ, ই এন টি, চক্ষুরোগে আক্রান্ত পাঁচ শতাধিক রোগীর চিকিৎসা করেন কলকাতার সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিং হোমের বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান এবং বিশিষ্ট চিকিৎসকবৃন্দ। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের পূর্বতন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল নিজে উপস্থিত থেকে রোগীদের চিকিৎসা করেন। ডাঃ তরুণ মণ্ডল ক্লাবের উদ্যোগী যুবকদের সঙ্গে অমর শহিদ ভগৎ সিং সহ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন নিয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁদের শিক্ষায় নিজেদের উন্নত চরিত্র গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ক্লাবের সভাপতি সুদর্শন নাইয়া, সম্পাদক দিলীপ পাল, রবীন বোলদে, জয়নাল সরদার, সত্যরঞ্জন সরকার, পঙ্কজ সরদার, মোবারক গাজী, সহিদুর রহমান, শ্যামল সরদার, অটল সরদার সহ প্রায় ৫০ জন এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন।

রূপনারায়ণ নদীবাঁধ স্থায়ীভাবে মেরামতের দাবি

পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট হাইস্কুলের সামনে রূপনারায়ণ নদীর বাঁধ প্রায় ২০০ ফুট বিপজ্জনকভাবে বসে গিয়েছে। এ ঘটনা বারবারই ঘটছে। সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের মতে নদীর গভীর স্রোত বাঁধের প্রায় তলা দিয়ে বইছে। তার ফলেই এই ভাঙন। সেচ দপ্তর এটা জেনেও যখন যেখানে ভাঙছে তখন সেখানে সাময়িকভাবে মেরামত করছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় হচ্ছে অথচ স্থায়ীভাবে সমস্যা সমাধানের কোনও ব্যবস্থা হচ্ছে না। তা ছাড়া নদীর উপর পাঁচটি ব্রিজ হয়েছে, বিদ্যুৎ দপ্তরের একটি টাওয়ার নদীর মাঝখানে বসানো হয়েছে, কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট ড্রেজিং করে পলিমাটি নদীর মাঝখানে ফেলছে। ফলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, যেটিও এই ভাঙনের একটি কারণ। এতে যে কোনও মুহূর্তে কোলাঘাট শহর বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

এই অবস্থায় কোলাঘাটের নাগরিকদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা 'কোলাঘাট রূপনারায়ণ নদীবাঁধ রক্ষা কমিটি' স্থায়ীভাবে ভাঙন রোধের দাবিতে ২০ মার্চ কোলাঘাট বি ডি ও-র কাছে ডেপুটেশন দেয়। নেতৃত্ব দেন কমিটির সভাপতি জয়মোহন পাল, সহ সভাপতি বিষ্ণুপদ বিষই, সম্পাদক শংকর মালাকার, শ্যামলকুমার বোস প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রীর ‘মন কি বাত’-এ কৃষকদের মন ও পেট কোনওটাই ভরবে না

একজন কৃষক ফসল-ভরা মাঠের মধ্য দিয়ে চলেছেন কোদাল হাতে, আর একজন রেডিও কানে হেঁটে চলেছেন আল দিয়ে। এই চিত্র সংবাদমাধ্যমে ছাপিয়ে প্রচার চলছে যেন কৃষকরা প্রধানমন্ত্রীর ‘মন কি বাত’ শুনতে ভীষণ উন্মুখ।

২৩ মার্চ আধ ঘণ্টার এক বেতার ভাষণে কৃষকদের উদ্দেশে জমি বিল নিয়ে নানা কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তারই নাম— ‘মন কি বাত’। জমি বিল নিয়ে প্রতিবাদ হচ্ছে দেশজুড়ে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে লোকসভায় বিলটি পাশ করাতে পারলেও রাজ্যসভায় পাশ করানোর আশা না দেখে বিজেপি দ্বিমুখী কৌশল নিয়েছে। একদিকে রাজ্যসভা অসময়ে মুলতুবি করে দিয়ে আবার অর্ডিন্যান্স জারির পথে যাচ্ছে, অন্যদিকে কৃষকদের বিভ্রান্ত করতে সরাসরি রেডিওতে ভাষণ দিচ্ছেন। মোদির বক্তব্য এই বিলের কৃষকস্বার্থ বোঝানোই এই বেতার ভাষণের উদ্দেশ্য।

দেশজুড়ে শুধু বিরোধী দল নয়, দলমতনির্বিশেষে কৃষকরা জমি বিলের বিরোধিতা করছেন, কিন্তু যে একচেটিয়া মালিকরা মোদিজিকে প্রধানমন্ত্রী করতে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে তাদের মন ভরবে কী করে? তারা যদি জমি দখল করে আবাসন, এস ই জেড গড়তে না পারে, তাহলে মোদিজির তরতর করে এগিয়ে যাওয়া সংস্কারের রথে জ্বালানি ভরবে কে? তাঁর শিল্পমুখী ভাবমূর্তি রক্ষা হবেই বা কী করে! যে যে সুবিধা দেওয়ার কথা বলে ভোটে শিল্পপতিদের সমর্থন আদায় করেছিলেন তিনি, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে না! শিল্পপতিরাই বা ছাড়বে কেন? কিন্তু মনে যাই থাক কৃষকদের সামনে তো তা ফাঁস হয়ে গেলে চলে না। তাই তাকে কৃষকদরদিও সাজার ভান করতে হচ্ছে। তাই ‘মন কি বাত’ আসলে মনের কথাটি গোপন রাখারই অনুষ্ঠান।

কী বলেছেন তিনি বেতারভাষণে? বলেছেন, রাজনৈতিক কারণে ধন্দ বা বিভ্রান্তি তৈরি করতে জমি বিল নিয়ে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে বিরোধীরা। সরকারের জমি নীতি যে কৃষক স্বার্থবিরোধী নয়, তা বোঝাতে মোদি বলেন, কৃষকদের দরিদ্র করে রাখার জন্যই অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে প্রচার হচ্ছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রের নীতি কার্যকর হলে কৃষকরা যেমন ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাবেন, তেমনই শিল্পায়নের পথ সুগম হলে কৃষকের ছেলেও কাজ পাবে। তিনি বলেন, জমি অধিগ্রহণের জন্য ১২০ বছর ধরে ব্রিটিশ আইন চলছিল। স্বাধীনতার পর থেকে তার বদল হয়নি। ইউপিএ সরকারের শেষদিকে তাড়াহুড়ায় ভ্রান্তিতে ভরা একটি আইন পাশ হয়। তাতে রেল, হাইওয়ে, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ১৩টি ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণের জন্য পৃথক আইন রয়েছে। ঐ ১৩টি আইনে ক্ষতিপূরণের হার বাড়িয়ে চার গুণ করার জন্যই নাকি সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করছে!

তিনি বলেন, ‘জমি অধিগ্রহণের নামে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জমি হাতিয়ে নেওয়া হতে পারে, এ নিয়ে চাষিদের মনে ক্ষোভ ও সংশয় রয়েছে। কিন্তু কথা দিচ্ছি, অধিগ্রহণের আগে দেখা হবে ঠিক কত জমি দরকার। এক ছটাকও বেশি নেওয়া হবে না।’ কী ধরনের জমি নেওয়া হবে? তিনি অঙ্গীকার করেছেন, প্রথমে সরকারি ও পরিত্যক্ত জমিই নেওয়া হবে। তারপর প্রয়োজনে চাষের জমি নেওয়া হবে। আর কী? না, শিল্প করিডর হলে কৃষকের ছেলেই তো চাকরি পাবে। কৃষকদের উদ্দেশে তিনি এও বলেছেন, আপনারা কে-ই বা চান যে আপনাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা দিল্লি বা মুম্বইয়ের বস্তিতে দিন কাটাক? কৃষকের ছেলে কি সারাজীবন কৃষক থাকবে? কথাগুলি শুনলে মনে হবে, কৃষকদের জন্য মোদিজির রাতের ঘুম চলে গিয়েছে, তাদের দুঃখে-ব্যথায় তিনি কাতর হয়ে পড়েছেন।

মনে পড়ে, গুজরাটের সানন্দে টাটার ন্যানো কারখানা বা সিঙ্গুরে ন্যানো কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণের আগে গুজরাট এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীদের কথা। সেই কথারই পুনরাবৃত্তি নয় কি মন কি বাত?

সত্যিই যদি কৃষকস্বার্থে জমি অধিগ্রহণ বিল আনে সরকার, তাহলে এত বোঝাতে হচ্ছে কেন? কৃষকরা কি নিজেদের ভালো নিজেরা বোঝে না, যে মোদিজিদের বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে ভালো-মন্দ? মোদিজি আওড়ে চলেছেন— জমি ছাড়া বৃহৎ শিল্প সম্ভব নয়। কে না জানে জমি ছাড়া শিল্প সম্ভব নয়। যদিও ‘কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া’ (ক্যাগ)-এর তথ্য অনুযায়ী শিল্পায়নের নাম করে এস ই জেড-এর জন্য নেওয়া জমির ৬৩ শতাংশই ফাঁকা পড়ে রয়েছে। তাহলে নতুন করে জমি নেওয়ার প্রয়োজন কী? মোদিজি বলছেন, গ্রামের উন্নয়ন ও গ্রামীণ পরিকাঠামোর বৃদ্ধিই কৃষকের স্বার্থ। গ্রাম ও শহরের বেকার যুবকদের প্রত্যাশা পূরণে এই বিল একধাপ অগ্রগতি বলেও তিনি প্রশস্তি গেয়ে রেখেছেন। অন্যদিকে শিল্পপতিদের সুবিধার গাওনাও গেয়ে রাখছেন। কৃষকদের মন ভোলাতে এও বলছেন, বৃহৎ পুঁজিমালিকদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতেই ২০১৩ সালের জমি অধিগ্রহণ আইনে পরিবর্তন আনতে চাইছেন। যিনি কর্পোরেট মালিকদের জন্য দেশের সমস্ত সম্পদ— জল, তেল, খনি, বিদ্যুৎ, জমি প্রতিটি ক্ষেত্রকে একের পর এক পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছেন, তার মুখে এ সাধু-বাণী মানায় কি?

মোদিজি বলেছেন, নতুন অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী, সরকারি-বেসরকারি যৌথ প্রকল্পের ক্ষেত্রে জমির মালিকানা সরকারের কাছেই থাকবে। সুতরাং বেসরকারি সংস্থাকে জমি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগও ভিত্তিহীন। এমনকী শিল্প করিডরও সরকারই গঠন করবে। যদিও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান জমি অধিগ্রহণ করতে চাইলে আগে যে নিয়ম ছিল তাই বহাল থাকবে। তাহলে বদল হল কই? আর সরকারের কাছে জমি থাকার যে অঙ্গীকার করেছেন প্রধানমন্ত্রী, তা তো জঘন্য প্রতারণা! সেই জমি তো পুঁজিপতিরাই ভোগ করবে! তাছাড়াও শিল্প করিডরের জন্য অধিগৃহীত জমিও তো সরকার বেসরকারি মালিকেদের দেবে। এর মধ্যে কোথায় কৃষকস্বার্থ?

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ বা পিপিপি মডেল নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য আরও চমৎকার! বলেছেন, যদি একটা রাস্তা তৈরি করতে ১০০ কোটি টাকা খরচ হয়, আর তা একটা বেসরকারি সংস্থা করে, তার সুফল কি দেশের ১০০ কোটি মানুষ পাবে না? যদি রাস্তা তৈরি হয় ও শিল্প করিডর তৈরি হয় তাহলে ৫০ বা ১০০ কিমি দূরত্বের মধ্যেই গ্রামের যুবকেরা কাজ পাবে। অধিগৃহীত জমিতে শিল্প হলে, সরকার পরিচালিত শিল্প করিডর হলে গ্রামীণ বেকার যুবকরা কাজ পাবে। এই সুবর্ণ সুযোগ কি চাষিদের হেলায় হারানো উচিত? মোদি অবশ্য স্বীকার করেছেন, অতীতে বৃহৎ শিল্পপতিদের স্বার্থ দেখতে গিয়ে বহুক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েছেন কৃষকরা। নামমাত্র মূল্য দিয়ে তাদের কাছ থেকে একরকম জোর করে কেড়ে নেওয়া হয়েছে জমি। এবার যাতে তা না হয়, তার জন্যই নাকি তিনি এই সুষ্ঠু আইন আনতে চাইছেন।

মোদির এ কথায় আস্থা রাখার কি কোনও বাস্তবতা আছে? দেশের আপামর কৃষিজীবী মানুষ ভুলে যায়নি গুজরাটের সানন্দ-এ জমিহারা কৃষকদের জমিতে টাটার ন্যানো কারখানার কথা, সেখানে অসংখ্য জমিহারা মানুষকে দেওয়া হয়েছিল চাকরির প্রতিশ্রুতি। কিন্তু চাকরি মেলেনি জমিহারা কৃষক সন্তানের, সামান্য যারাও পেয়েছেন তারা দারোয়ান-কেয়ারটেকারের কাজ পেয়েছেন। মূলত উচ্চ প্রযুক্তিবিদরাই চাকরি পেয়েছে সেখানে। বর্তমানে বেশিরভাগ কারখানা অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর এবং পুঁজিনিবিড়— শ্রমনিবিড় নয়। আবার সেই কারখানার বর্তমান হাল কী? বাজারের অভাবে ন্যানো কারখানায় উৎপাদন হয় সপ্তাহে ২-৩ দিন। বাকি সময় উৎপাদন বন্ধ থাকে। আমাদের দেশ সহ গোটা বিশ্বেই চলছে শিল্পে মন্দা। এ অবস্থায় মোদি বললেই শিল্প হবে?

২০১৩-র আইনে বলা ছিল, ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ ও পিপিপি মডেলের ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ জমি মালিকের অনুমতি প্রয়োজন। বর্তমান যে বিল বিজেপি সরকার আনতে চাইছে, তাতে সেই বিষয়টিই নেই। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে শিল্পপতিদের গায়ের জোরে কৃষকের জমি দখলের সিলমোহর দিতে চাইছে তারা। মোদিজির ‘কৃষক স্বার্থ’ তো আসলে এটাই!

কৃষকরা যাতে কর্পোরেটদের স্বার্থে আনা জমি বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন না গড়ে তোলে তার জন্যই প্রধানমন্ত্রীর এই অমৃতবাণী, যা কৃষকদের জীবনে বিষপানের সামিল হবে। তিনি গত এক বছরে কৃষক দরদের কী নমুনা রেখেছেন? কৃষকদের জন্য কী প্রকল্প নিয়েছেন যাতে অভাবি, ঋণের ভারে জর্জরিত কৃষকদের আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে না হয়? হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাবে কৃষক আত্মহত্যার মিছিল চলছে, বন্ধ করার জন্য কী পদক্ষেপ নিয়েছেন তিনি? তাঁর নেওয়া নীতির ফলে এ রাজ্যে পাট চাষের সঙ্গে যুক্ত চল্লিশ লক্ষ মানুষের জীবনে অন্ধকার নেমে এসেছে। তাঁর কৃষক দরদি মিষ্টি ভাষণে কৃষকদের মনও ভরবে না, পেটও ভরবে না।

আর দুনিয়া জুড়ে কোথাও যখন শিল্পায়ন হচ্ছে না, তখন ভারতে শিল্পায়ন হবে, এ তো মস্তবড় ধাপ্পাবাজি। আসলে দেশি-বিদেশি শিল্পমালিকদের জন্য শহরকে অত্যাধুনিক করে সাজাতে এবং আবাসন শিল্পের প্রসার ও নির্মাণ কোম্পানিগুলিকে সুযোগ করে দিতে কৃষকের থেকে জোর করে হাজার হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। ‘গ্লোবাল কনস্ট্রাকশন পারস্পেকটিভ ও অক্সফোর্ড ইকনমিক্স’-এর যৌথ গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, নির্মাণ শিল্পে ভারত ২০২৫ সালের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম হওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। এত যে ‘শিল্পায়ন শিল্পায়ন’ রব তুলছেন মোদিজি আর তাঁর দোসররা, তার হাল কী? গত দু’দশক ধরে উৎপাদন শিল্পে ভারত বন্ধ্যাদশায় রয়েছে। ফলে আবাসন ব্যবসাই শিল্পপতিদের আসল উদ্দেশ্য। এই পরিসংখ্যানগুলি শিল্পায়নের ফানুস ফাটিয়ে দিয়েছে আর মুখোশ খুলে দিচ্ছে ‘শিল্পায়নের’ কারিগরদের। এই হল মোদিজি এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষক একচেটিয়া মালিকদের আসল ‘মন কি বাত’।

মৌলবাদীরা মানবতার শত্রু

দুয়ের পাতার পর

উগ্রপন্থার নাম করে প্রথমে ফ্রি সিরিয়ান আর্মি, তারপর আল নুসরা এবং আল কায়দার বিভিন্ন গোষ্ঠীকে মদত দিয়েছে। বিভিন্ন উপজাতিগত বৈরিতা বাড়াতে ইন্ধন জুগিয়েছে। সিরিয়ার ফারুক ব্রিগেড ২০১১ সাল নাগাদ স্লোগান তুলেছিল ‘খ্রিস্টানরা যাও বেইরুটে, আলওয়াইটরা কবরে’। যার হাত ধরে সিরিয়ায় গণহত্যা চলেছে। আমেরিকা ছিল এই ফারুক ব্রিগেডের অস্ত্র এবং সমস্ত সরঞ্জামের ঠিকেদার। এই ফারুক ব্রিগেড এবং ফ্রি সিরিয়ান আর্মির একাংশই আইএসআইএস বা আইএসএল (ইসলামিক স্টেট অফ লেভেন্ট) নাম নিয়েছে।

একদিকে মধ্যপ্রাচ্যের যে অঞ্চলগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষতার কিছুটা চর্চা ছিল তাও ধ্বংস হচ্ছে। অন্যদিকে আমেরিকা ব্রিটেনের সামরিক হস্তক্ষেপ এবং গায়ের জোরে দখলদারি এই সমস্ত অঞ্চলে মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করায় তারা যখন এর বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠছে সেই ক্ষোভকে মার্কিন মিত্র শক্তিগুলি সুকৌশলে চালনা করছে গোষ্ঠীগত সংঘর্ষের অন্ধগলিপথে। মৌলবাদী অন্ধতা এই কাজে বড় হাতিয়ার। আবার আমেরিকা ব্রিটেন সরাসরি অথবা ঘুরপথে এই যুযুধান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একদলকে অস্ত্র সরবরাহ করছে, তাদের গণহত্যায় পর্যন্ত মদত দিচ্ছে। আমেরিকা এতদিন বলছিল তারা স্বৈরাচারী শাসকদের হটানোর জন্য লিবিয়া, সিরিয়া এবং অন্যান্য দেশে মডারেট বা মধ্যপন্থী এবং যুক্তিবাদী বা র‍্যাডিকাল বিদ্রোহীদের সাহায্য করছে এবং সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সিরিয়া, লিবিয়া, ইরাক, ইয়েমেন, মিশর সহ এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের তথাকথিত মডারেট এবং র‍্যাডিকাল জঙ্গিরা দলে দলে মার্কিন অস্ত্র এবং সরঞ্জাম সহ আইএস-এ ভিড়ছে। লিবিয়ায় গদ্দাফিকে হটানোর জন্য আমেরিকা একসময়কার ঘোষিত জঙ্গি আব্দেল হাকিম বেলহাজকে জেল থেকে বার করে লিবিয়ায় পাঠিয়েছিল। আমেরিকা-ব্রিটেন বেলহাজকে মহান গণতান্ত্রিক বলে খুব প্রশংসা করেছিল তখন। সেই বেলহাজ এখন উত্তর আফ্রিকায় আইএস-এর প্রধান হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করেছে। আইএস জঙ্গিরা চিকিৎসা সংক্রান্ত সাহায্য সবচেয়ে বেশি পাচ্ছে মার্কিন মিত্র ইজরায়েলের কাছ থেকে। সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন, ইরান সহ যারাই মার্কিন স্বার্থের বিরোধীতা করেছে তাদের বিরুদ্ধেই সবচেয়ে বেশি লড়ছে আইএস জঙ্গিরা।

মৌলবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ মানব সভ্যতার ঘৃণ্য শত্রু। এই উভয় শত্রুকে সমূলে উৎপাটিত করার মতো শক্তি অর্জন করতে হলে মানবজাতিকে আবার সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লড়াইতে যেতেই হবে। কিন্তু সেই লড়াইয়ের ক্ষণ যত দিন না আসছে, তার জমি তৈরি করার জন্য চাই মানুষের জীবনের নানা দাবি নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন। যে আন্দোলন সঠিক নেতৃত্বে চালিত হলে গড়ে উঠবে গণতান্ত্রিক চেতনা। বিশ্বজুড়ে মৌলবাদের উত্থান রুখতে হলে এই হল একমাত্র পথ।

সিপিআই পার্টি কংগ্রেসে কমরেড প্রভাস ঘোষ

একের পাতার পর

কিন্তু দুঃখের কথা হল, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে কবরে পাঠাবে যারা, অর্থাৎ বিশ্বের বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণি, তারা কবর খোঁড়ার জন্য প্রস্তুত নয়।

মহান বিশ্বসমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়েছে। এটা ঘটেছে শোধনবাদী নেতৃত্ব কর্তৃক মহান স্ট্যালিনকে অস্বীকার করার জন্যই। ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে লড়াই করার নামে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধতা করার দ্বারা লেনিনবাদের অথরিটিকেই অস্বীকার করা হয়েছে ও সেই পথেই প্রতিবিপ্লবের জমি তৈরি করা হয়েছে।

কিন্তু আশার আলোও আছে। বিশ্বের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। তারা নেতৃত্ব চাইছে। আজ হোক কাল হোক, আমরা মনে করি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈপ্লবিক উপলব্ধি নিয়ে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলন মাথা তুলবে, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের কবর খোঁড়ার জন্য আবার শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব গড়ে উঠবে।

আমাদের দেশে আপনারা জানেন, একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠীগুলি, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলি ও বুর্জোয়াশ্রেণি এইবার সম্মিলিত প্রয়াস চালিয়ে বিজেপিকে সামনে এনেছে ও কেন্দ্রের সরকারে বসিয়েছে একদিকে তাদের নির্মম পুঁজিবাদী শোষণ চালিয়ে যেতে ও তীব্রতর করতে, অন্যদিকে ফ্যাসিবাদী শাসন, যা একটি গুরুতর বিপদ হিসাবে সামনে আসছে, তা কায়েম করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে।

আমাদের দেশে পুঁজি ইতিমধ্যেই একচেটিয়া পুঁজির রূপে কেন্দ্রীভূত, রাষ্ট্রক্ষমতারও কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে এবং প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়েছে। আদর্শ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভয়াবহ আক্রমণ চালানো হচ্ছে— মান্ধাতা আমলের অচল ধর্মীয় ধ্যানধারণা, মধ্যযুগীয় অন্ধকারময় চিন্তাভাবনাকে উসকানো ও উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, মহৎ করে দেখানো হচ্ছে, এমনকী এই হাস্যকর দাবিও করা হচ্ছে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের সকল আবিষ্কারই পুরাতন ভারতীয় বিজ্ঞান পূর্বেই আবিষ্কার করেছিল। এসবই প্রচার করা হচ্ছে উগ্র হিন্দুত্ববাদ ও প্রাচীন ঐতিহ্যবাদকে খুঁচিয়ে তুলতে।

আমার স্মরণে আছে সমগ্র বিশ্ব যখন হিটলারের নিন্দায় মুখর ছিল, তখন আমাদের দেশের একটি কণ্ঠ আর এস এস নেতা গোলওয়ালকর হিটলারের প্রশংসায় সরব হয়ে বলেছিলেন, জার্মান জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য হিটলার জার্মানি থেকে যেভাবে ইহুদিদের বিতাড়ন করেছেন, সেটাই ভারতে 'হিন্দু জাতীয়তাবাদের' বিশুদ্ধতা রক্ষা করারও উপায়।

আর এস এস-এরই একটি শাখা সংগঠন হচ্ছে বিজেপি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আর এস এস কখনও যোগ দেয়নি। বরং, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন হিন্দু জাতীয়তার বদলে ভূখণ্ডকেন্দ্রিক জাতীয়তাকে ভিত্তি করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই সকল ভারতবাসীর সাধারণ বা মূল শত্রু হিসাবে গণ্য করায়, তার সমালোচনা করেছে আর এস এস। ভারতীয় নবজাগরণের মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণাকে আর এস এস ধ্বংস করছে। তাই আমরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেখছি, বিজ্ঞানের মৌলিক দিকগুলি বাদ দিয়ে শুধু কারিগরি দিকের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে এবং তার সাথে মেশানো হচ্ছে যাবতীয় অধ্যাত্মবাদী তমসাচ্ছন্ন চিন্তাভাবনা। পরিণামে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সকল প্রকার মূল্যবোধকে ধ্বংস করা হচ্ছে। এটা পুরোপুরি ফ্যাসিবাদী আক্রমণ। একে পরাস্ত করার জন্য শক্তিশালী আদর্শগত আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

বর্তমানে বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলন জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু বামপন্থী কারা? আমাদের দেশে নিজেদের মার্কসবাদী বলে যারা মনে করে, তাদেরই বামপন্থী হিসাবে গণ্য করতে হবে, যদিও এদের মধ্যে মার্কসবাদের উপলব্ধি ও প্রয়োগ নিয়ে অবশ্যই মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আদর্শগত পার্থক্যকে কেন্দ্র করে আদর্শগত সংগ্রামও থাকবে। আদর্শগত সংগ্রাম চলবে ঐক্যকে দুর্বল করার জন্য নয়, শক্তিশালী করার জন্য। নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া উন্নত করার জন্যও আদর্শগত সংগ্রাম প্রয়োজন।

কাদের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দল বলব? এ বিষয়ে বহুরকম বিভ্রান্তি আছে। বিজেপি'র বিরুদ্ধতা করলেই কোনও দল ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায় না। এই ধরনের বিরুদ্ধতা ভোটে সুবিধা পাওয়ার জন্যও করা হতে পারে। বিজেপির বিরুদ্ধতা করছে কংগ্রেস, সেজন্য কংগ্রেস কি ধর্মনিরপেক্ষ দল হয়ে যায়? এরকম অন্যান্য আঞ্চলিক, জাতিবাদী, প্রাদেশিকতাবাদী দলগুলিও আছে, যাদের ধর্মনিরপেক্ষ বলা যায় না।

ধর্মনিরপেক্ষতার একটি ইতিহাসপ্রদত্ত অর্থ আছে। ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার উদ্ভবই ঘটেছে ইউরোপীয় নবজাগরণ, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময়ে। দর্শনগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে কোনওরকম অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা, বাস্তব হিসাবে একমাত্র প্রকৃতি জগৎ ও পার্থিব বিশ্বকেই স্বীকার করা।

রাজনৈতিক দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ— রাজনীতি, শিক্ষা ও সামাজিক বিষয়ের সাথে ধর্মের কোনও সম্পর্ক রাখা চলবে না। ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি নিছক একটি শব্দ রূপেই আছে, চর্চায় তা নেই। সকল ধর্মে উৎসাহদান কখনই ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। রাষ্ট্র ও তার সকল ক্রিয়াকলাপকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

গণতান্ত্রিক দলগুলি বলতে কাদের বুঝব? গণতান্ত্রিক দল বলব সেই দলকেই, যারা মুখে নয়, কাজে ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করে, জাত-পাত, প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে, নিরবচ্ছিন্নভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধতা ও বামপন্থাকে সমর্থন করে, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির পক্ষে দাঁড়ায়। সরকারে বসলেও যে দলগুলি গণতান্ত্রিক আন্দোলন, কৃষক ও শ্রমিকদের আন্দোলনকে দমন করবে না।

এই হচ্ছে বিষয়, যা নিয়ে আমাদের গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা দরকার। ভোটে সুবিধা পাওয়ার জন্য জগাখিচুড়ি জোট করা একেবারেই ঠিক নয়। বামপন্থা, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিকতার পরিষ্কার ব্যাখ্যা থাকা আবশ্যিক।

প্রথমত, ধর্মীয় মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য শক্তিশালী আদর্শগত আন্দোলন আজ জরুরি। এইসব ক্ষতিকর চিন্তাভাবনার প্রভাব থেকে জনগণের মনকে মুক্ত করা বর্তমানে অতীব জরুরি প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, অত্যন্ত শক্তিশালী জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। যেমনটি ভারতে স্বাধীনতার পরপরই দেখা গিয়েছিল। সেটা ছিল ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের গৌরবজনক অধ্যায়। প্রয়োজনে বুলেট-বেয়নেটের মুখে দাঁড়িয়ে ঐ ধরনের শ্রেণি সংগ্রাম ও গণআন্দোলন আমাদের গড়ে তুলতে হবে। একমাত্র এভাবেই বামপন্থা জনগণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরায় অর্জন করতে পারে।

এই হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের দলের মূল্যায়ন। আপনাদের কাছে তা রাখলাম। আশা করি আপনারা তা আন্তরিকভাবে বিবেচনা করবেন। আর সময় নেওয়া আমার উচিত নয়। মনে হয়, আপনারা ইতিমধ্যেই শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, আপনাদের সকলকে লাল সেলাম জানিয়ে শেষ করছি।

পুঁজিবাদী লন্ডনেও বাড়ছে ফুটপাতবাসীর সংখ্যা

অনেকের কাছেই লন্ডন হল স্বপ্নের শহর। মুখ্যমন্ত্রীরও স্বপ্ন কলকাতাকে তিনি লন্ডন বানাবেন। অথচ সেই আলো-ঝলমল লন্ডনে যখন রাত নামে, ফুটপাতগুলো ভরে ওঠে সারি সারি শুয়ে থাকা ঘুমন্ত মানুষের ভিড়ে। সেই ভিড় ক্রমাগত বেড়ে চলেছে!

অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে? লন্ডনের খোদ সরকারি রিপোর্টই সম্প্রতি এই তথ্য প্রকাশ করেছে। লন্ডনের স্থানীয় সরকার এবং সমাজ দপ্তর সম্প্রতি জানিয়েছে, ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডনে ২০১৩-'১৪ — এই এক বছরে ঘরহারা মানুষের সংখ্যা ৩৭ শতাংশ বেড়ে গেছে। গোটা দেশেই এই হার বেড়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, শুধু লন্ডন শহরেই প্রায় ৭৫০ জন মানুষ ফুটপাতে সংসার পেতেছেন।

এ হেন রিপোর্টে মুশকিলে পড়েছেন সে দেশের সরকারি নেতা-মন্ত্রীরা। লন্ডনের মেয়র বরিস জনসন ২০১২ সালের মধ্যে গৃহহীনদের সমস্যা দূর করবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন বার বার। এই রিপোর্ট প্রতিশ্রুতি পালনে তাঁর দায়বদ্ধতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। সম্মান রক্ষার চেষ্টায়, ঘরহারাদের সমস্যা নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা বোঝাতে এক নাটকীয় কার্যক্রমের আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। লন্ডনের দুটি সংবাদপত্রের মালিক ধনকুবের ইয়েভগেনি লেবেদফ-কে সঙ্গে নিয়ে একটি রাত ফুটপাতে কাটিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, শুধু এ দেশের মন্ত্রীরাই নয়, স্বপ্নের লন্ডনেও মন্ত্রীরা একই রকম ধোঁকাবাজ। গৃহহীনদের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ও প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়েছেন।

স্বাভাবিকভাবেই এ সব প্রতিশ্রুতিতে বাস্তব পরিস্থিতি পাল্টাবার নয়। বিশ্বজোড়া মন্দার ধাক্কায় ব্রিটেনের অর্থনীতি আজ গভীর সংকটে। বেকারি, ছাঁটাই, গরিবির কালো ছায়া ক্রমেই দীর্ঘতর হচ্ছে। সংকটে সংকটে জেরবার হচ্ছে খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন। অতীতে সোভিয়েট ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি নাগরিকদের জীবনের প্রায় সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। আসলে রাষ্ট্র সেখানে ছিল জনগণের। পাছে নিজের দেশের মানুষও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেই আশঙ্কায় পুঁজিবাদী দেশের বিপ্লবভীত সরকারগুলিও সেই সময় নাগরিকদের জন্য নানা কল্যাণমূলক সামাজিক প্রকল্প গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অর্থনৈতিক ভাবে বিশ্বের সামনের সারির পুঁজিবাদী দেশ হিসাবে ব্রিটেনেও নাগরিকদের জন্য নানা ধরনের সরকারি দান-ধ্যানের ব্যবস্থা ছিল। এখন আর সমাজতন্ত্রের ভয় নেই। মন্দাক্রান্ত অর্থনীতির বর্তমান বেহাল দশায় সেই সব সরকারি খরচে এখন ব্যাপক কাটছাঁট করা হচ্ছে। মন্দার দাওয়াই হিসাবে পুঁজিবাদী পণ্ডিতদের দেওয়া ব্যয়সংকোচের প্রেসক্রিপশন মেনে চলতে গিয়ে প্রধানত কোপ পড়ছে সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি ব্যয়গুলির উপর। সব মিলিয়ে কম ভাড়ায় মাথা গোঁজার ঠাঁই দিন দিন অমিল হয়ে উঠছে গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে। বেকারি, ছাঁটাই, গরিবিতে বিপর্যস্ত মানুষের সংখ্যার সাথে সাথে বেড়ে চলেছে ঘরহারা মানুষের সংখ্যাও।

এবারের মন্দা মরতে বসা এই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার নিজস্ব নিয়ম থেকেই উদ্ভূত এক সংকট। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে এই সংকট কাটানো যাবে না। ফলে নেতা-মন্ত্রীরা যত প্রতিশ্রুতিই দিন, ব্রিটেনের মতো একটি সংকট-জর্জরিত পুঁজিবাদী দেশে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা কমবার নয়, বরং তা বেড়েই চলবে।

বিপ্লবী দল বিচারের সঠিক পদ্ধতি

তিনের পাতার পর

ভিত্তি করে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে যৌথ জ্ঞান গড়ে ওঠে, সেটাই পথনির্দেশ হিসাবে প্রতিটি কর্মী ও নেতার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত ধ্যানধারণা ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। আবার, এই যৌথ জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে বাস্তবে সামাজিক জীবনে তাকে প্রয়োগ করতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি নেতা ও কর্মীর অভিজ্ঞতার সাথে যৌথ জ্ঞানের যে প্রতিনিয়ত সংঘাত ঘটে, তার দ্বারা আবার এই যৌথ জ্ঞান সমৃদ্ধ হয় এবং নেতা ও কর্মীদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও রুচির মানও ক্রমাগত উন্নত হতে থাকে।

মনে রাখতে হবে, পার্টির অভ্যন্তরে নেতা ও কর্মীদের পরস্পর সম্বন্ধ দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির এই সম্পর্কের দ্বারা পরিচালিত না হলেই সে সম্পর্কের চরিত্র হয়ে পড়ে যান্ত্রিক। এবং এই অবস্থা পার্টির মধ্যে থাকলে বুঝতে হবে, পার্টির অভ্যন্তরে ব্যক্তিবাদকে খতম করা দূরের কথা, বরং ব্যক্তিবাদ পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে কাজ করে চলেছে এবং এই অবস্থায় পার্টিটি নামে কমিউনিস্ট পার্টি হলেও বুর্জোয়া বা পেটিবুর্জোয়া পার্টির মতোই আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার সংমিশ্রণে কার্যত যান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক উপায়ে কেন্দ্রীভূত পার্টিতে পর্যবসিত হয়েছে। এই অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী রূপে পার্টির উচ্চস্তরে ব্যুরোক্রেটিক নেতৃত্বের জন্ম হয়ে থাকে। ফলে, এই অবস্থায় পার্টি নেতাদের মধ্যে বিপ্লবী রাজনৈতিক চরিত্রের পরিবর্তে শুধু যে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে ওঠে তাই নয়, পার্টি নেতারা নিকৃষ্ট ধরনের ব্যক্তিবাদের খপ্পরে পড়তে বাধ্য হন এবং পার্টিটি কার্যত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তার একদিকে থাকে আমলাতান্ত্রিক এবং বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত একদল নেতা ও তাত্ত্বিক, অন্যদিকে কর্মীদের মধ্যে অন্ধতা ও অন্ধ আনুগত্যের ফলে থাকে অন্ধভাবে অনুসরণকারী সৎ, ডেডিকেটেড, নিষ্ঠাবান অথচ উগ্র কর্মীর দল। ফলে বুঝতে পারছেন, এই অবস্থায় পার্টির অভ্যন্তরে তত্ত্ব এবং কর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় থাকতে পারে না। ফলে তত্ত্ব হয়ে পড়ে মনগড়া এবং বাস্তববিবর্জিত (abstract), আর কার্যকলাপ হয়ে পড়ে অন্ধ ও উগ্র ধরনের। এখন সি পি আই, সি পি আই (এম) এবং নকশালপন্থী গ্রুপগুলির কার্যকলাপ, সংগঠনপদ্ধতি, কর্মীদের চেতনার মান প্রভৃতির দিকে লক্ষ করলেই বুঝতে অসুবিধে হবে না যে, ঠিক এই অবস্থাই এদের সকলের মধ্যে বর্তমান।

(কেন এস ইউ সি আই (সি) ভারতবর্ষের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল— শিবদাস ঘোষ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড)

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

আসামে ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব হরণের বিরুদ্ধে নাগরিক আন্দোলন

আসামে ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের বিদেশি সাব্যস্ত করার দুরভিসন্ধি প্রসূত ভুয়া নাগরিকপঞ্জি (এন আর সি) প্রণয়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি চলছে। আসামের বরাক উপত্যকার কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ — এই তিন জেলার বুদ্ধিজীবীদের আহ্বানে ১৫ মার্চ শিলচরের ছোটলাল শেঠ ইন্সটিটিউট হলে অনুষ্ঠিত নাগরিক কনভেনশনে এই আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়। শিলচর গুরুচরণ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ তাপসশঙ্কর দত্ত, হাইলাকান্দির নাগরিক স্বার্থ রক্ষা পরিষদের সভাপতি মানসকান্তি দাস এবং করিমগঞ্জের বিশিষ্ট সমাজকর্মী প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক নলিনাক্ষ দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলীর পরিচালনায় ওই তিন জেলার কবি, সাহিত্যিক, আইনজীবী, বিশিষ্ট চিকিৎসক সহ উপস্থিত নাগরিকরা এন আর সি প্রণয়নে সৃষ্টি হওয়া জটিলতা নিয়ে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন। কনভেনশনের

আমন্ত্রিত বক্তা এস ইউ সি আই (সি)-র আসাম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের আসাম রাজ্য সম্পাদক কমরেড সুরজ্জমান মণ্ডল এন আর সি প্রণয়নের পিছনে থাকা রাজ্যের উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের দুরভিসন্ধিগুলি তুলে ধরেন। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখান, কীভাবে রাজ্যে বসবাসকারী প্রায় ৫০-৬০ লক্ষ ধর্মীয় ও ভাষিক সংখ্যালঘু প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকের নাগরিকত্ব হরণ করার নীল নক্সা তৈরি হয়েছে। তিনি উপস্থিত জনগণকে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করার লক্ষ্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এই উদ্দেশ্যে শক্তিশালী দীর্ঘমেয়াদি গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য 'নাগরিকত্ব সুরক্ষা সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়। তিন জেলার ১৬ জন কবি, সাহিত্যিক, আইনজীবী, সমাজকর্মীদের উপদেষ্টামণ্ডলীতে রেখে পাঁচ আহ্বায়ক সহ মোট ৫৬ জনের কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

এই কমিটি সারা দেশের সাথে আসামে এন আর সি করার পূর্বে 'ডি' ভোটার ও শরণার্থী সমস্যার সমাধান, এন আর সিতে নাম অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত ১৬টি নথির বাইরেও যে কোনও নথিকে প্রামাণ্য দলিল হিসাবে গ্রহণ করা এবং আইন শাস্ত্রে থাকা সাব কামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স বা প্রতিবেশীর সাক্ষ্য নেওয়ার যে স্বীকৃত নিয়ম রয়েছে সেটাকেও এই ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে দীর্ঘ আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ সাংসদ, বিধায়কদের স্মারকপত্র প্রদান, এলাকায় এলাকায় গণ কমিটি গঠন, হাটে-বাজারে, গ্রাম-শহরে অসংখ্য পথসভা, প্রচারপত্র বিলির কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।

নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিতে ছত্তিশগড়ে বিক্ষোভ

দুরগ-এর উৎকল নগরে গরিব ঘরের এক নিখোঁজ বালিকাকে খুঁজে বার করা, বিজয়নগরের ন'বছরের বালিকার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষীদের শাস্তি, গয়া নগরের দুঃস্থ বালিকার দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ক্ষতিপূরণের দাবিতে এবং সরকারের জনবিরোধী মদ নীতির প্রতিবাদে ২০ মার্চ এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে দুরগ-এর কাছারি মোড়ে সারাদিনব্যাপী ধরনা প্রদর্শন করা হয়। পরে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে লিখিত স্মারকলিপি কালেকটরের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ওড়িশায় সর্বনাশা জমি বিলের প্রতিবাদ

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জমি অধিগ্রহণের নতুন আইন করতে চলেছে। এই আইনে জমি দখল করতে কৃষক বা গ্রামবাসীদের কোনও অনুমতি নিতে হবে না, তাদের ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিতে হবে না সরকারকে। পুঁজিপতিদের মুনাফার প্রয়োজনে সরকার সেই জমি ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেবে।

এই সর্বনাশা জমি বিল বাতিলের দাবিতে ২০ মার্চ এআইকেকেএমএস-এর ওড়িশা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে স্মারকলিপি ওড়িশার রাজ্যপালের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক ও সভাপতি যথাক্রমে কমরেডস রঘুনাথ দাস ও উদ্ধব জেনা।

পুর নির্বাচন প্রসঙ্গে

আসন্ন পুরনির্বাচন প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ২৩ মার্চ নিম্নের বিবৃতি দিয়েছেন।

এ রাজ্যে সম্প্রতি বিপদগ্রস্ত আলুচাষিদের একের পর এক আত্মহত্যার উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে আলুচাষিদের সংকট এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি তথা নারী নিগ্রহ-বিদ্যুৎ-স্বাস্থ্য-শিক্ষা, রেলভাড়া বৃদ্ধি, রেলের বেসরকারিকরণ, জমি অধিগ্রহণ অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি সমস্যার সমাধানে ধারাবাহিক আন্দোলনে এবং গত ৫ ফেব্রুয়ারির আইন অমান্যে পুলিশের আক্রমণে দুটি কর্মীর চোখ নষ্ট হওয়ায় তাদের চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহে আমাদের দল এস ইউ সি আই (সি) নেতা-কর্মীরা ব্যস্ত থাকায় আমরা পৌর নির্বাচনে সীমিত ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সিপিএম নেতৃত্বের প্রস্তাবের ভিত্তিতে সিপিএম রাজ্য অফিসে অনুষ্ঠিত উভয় দলের নেতাদের আলোচনায় স্থির হয়, বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসকে পরাস্ত করতে জেলায় জেলায় এস ইউ সি আই (সি), সিপিএম সহ বামদলগুলি আলোচনা করে আসন নিয়ে বোঝাপড়া করবে। বাস্তবে সিপিএম-এর উদ্যোগে চারটি জেলায় আলোচনা হলেও বীরভূম ও পুরুলিয়া জেলার তিনটি আসনে বোঝাপড়া হয়েছে। এছাড়া আর কোনও জেলাতে আলোচনাই হয়নি। ফলে কিছু আসনে সিপিএম-এর সাথে এস ইউ সি আই (সি)-র বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। লোভ-প্রলোভন, ভয়ভীতি প্রদর্শন সহ শাসকদলগুলির সমস্ত প্ররোচনাকে পরাস্ত করে জনস্বার্থে গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করতে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য রাজ্যের পৌর এলাকার অধিবাসীদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। যে সব আসনে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি না, সেখানে বামপন্থী প্রার্থীদের সমর্থন করার কথা বলছি।

বালুরঘাটে ছাত্র-যুবদের পথ অবরোধ

১০ মার্চ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে ডি এস ও এবং ডি ওয়াই ও-র নেতৃত্বে ছাত্র-যুবরা বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে। তাদের দাবি ছিল — ১০৮ প্রকার ওষুধের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া চলবে না, বিজ্ঞাপনে নগ্ন নারীদেহের প্রদর্শন বন্ধ করতে হবে, শিক্ষান্তে কাজের সুব্যবস্থা করতে হবে, এস এস সি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি দ্রুত প্রকাশ করতে হবে, শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করতে হবে, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল পুনরায় চালু করতে হবে, ইচ্ছুক সকল ছাত্রকে পড়ার সুযোগ দিতে হবে। মিছিল শেষে ছাত্ররা বালুরঘাট বাস স্ট্যান্ডে অবরোধ করে। এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন ছাত্র সংগঠনের জেলা সম্পাদক ও সভাপতি যথাক্রমে কমরেডস নয়ন মহন্ত ও সুয়েল রানা সরকার এবং যুব সংগঠনের জেলা সম্পাদক ও সভাপতি কমরেডস বীরেন মহন্ত ও নন্দা সাহা।

মহান ২৪ এপ্রিল
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে
সমাবেশ
শহিদ মিনার ময়দান • বিকাল ৪টা
বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক
সভাপতি ঃ কমরেড সৌমেন বসু, রাজ্য সম্পাদক

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২২৭৬২৫৯, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucic.in